নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৪, পৃঃ৮৩-১০৯
©১৯৯৯ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বাংলাদেশে নারী, উন্নয়ন এবং মৌলবাদ

আইনুন নাহার*

ভূমিকা

লিঙ্গীয় মতাদর্শ, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও চর্চা এবং ধর্মীয় মৌলবাদের রাজনীতি কিভাবে মিথষ্ক্রিয়া করে এবং নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে এ বিষয়গুলোর সংমিশ্রণ নারীর জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করে? সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘটে যাওয়া এনজিওদের বিরুদ্ধে 'মৌলবাদী' আক্রমণের কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য নিবন্ধে উপরোক্ত প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয়েছে। এটি লক্ষণীয় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'মৌলবাদী' শক্তির আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী নারীরা। বাংলাদেশের উন্নয়ন ডিসকোর্সে 'দরিদ্র গ্রামীন নারী'দের ক্ষমতায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার প্রেক্ষিতে এই পরিস্থিতি দুটো বিপরীত শক্তির মধ্যকার দ্বন্দ্ব হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছে, যেখানে নারী রয়েছে এই বিবাদের কেন্দ্রে।

বাংলাদেশে তথা বহির্বিশ্বে এনজিও-বিরোধী 'মৌলবাদী' এই ক্ষিপ্ততাকে খুব সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে (সংবাদমাধ্যমে, এবং কখনো কখনো একাডেমিক মহলেও) 'ঐতিহ্য' এবং 'আধুনিকতা'র মধ্যকার দ্বন্দ্ব হিসাবে, যদিও বাস্তব পরিস্থিতি বেশ জটিল। মূলতঃ ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান সনাতনী ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ থেকে ভিন্ন, এবং নির্দিষ্ট স্থানিক প্রেক্ষাপটে তথা বৃহত্তর বৈশ্বিক অঙ্গনে বিষয়টি বোঝা জরুরী। একইভাবে 'উন্নয়ন' বলতে যা বোঝানো হয় তা হচ্ছে এমন একটি জটিল প্রক্রিয়া যা বৈশ্বিক, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিরাজমান বিবিধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তির মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ফলে 'ধর্মীয় মৌলবাদ' এবং 'উন্নয়ন প্রক্রিয়া'র মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য বিভিন্ন বিষয়কে বিবেচনা করতে হবে।

বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে যে বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ তা হল কেন এবং কোন প্রক্রিয়ায় নারীরা এসব দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। বস্তুতঃ অন্যান্য দেশেও একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে উপরে যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, এসব ঘটনার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এখনও 'মৌলবাদ' ও 'আধুনিকতা'কে বিপরীত শক্তি হিসেবেই বেশী দেখা হয় বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, Ahmed ও Donan (1994:14) লিখেছেন, 'বিশেষ করে মুসলিম নারীরা পিষ্ট হচ্ছে ইসলামী মৌলবাদ ও আধুনিকতার মধ্যে, এবং আধুনিকতা ও উত্তর-আধুনিকতার মধ্যে' (এছাড়া দেখুন, Baykan 1990)। এরকম দৃষ্টিভঙ্গী আসলে আমাদেরকে উক্ত

---

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

লেখকদেরই বর্ণিত 'পাশ্চাত্যে ইসলামের (ভুল) উপস্থাপনা' থেকে খুব বেশীদূর নিয়ে যায় না। এর চেয়েও বড় কথা হল, এসব আলোচনায় 'মৌলবাদ' ও 'আধুনিকতা' (বা 'উন্নয়ন')-র সম্পর্ক অনুধাবন করার ক্ষেত্রে, এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক বিশ্লেষণে, লিঙ্গকে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে গণ্য করার কাজটি এখনও খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না, যেন বিষয়টি একমাত্র নারীবাদীদেরই করণীয়। তবে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শ ও স্বার্থের সংঘাত যে প্রায়ই নারীদের কি করা/হওয়া উচিত বা উচিত নয় সে প্রশ্নকে ঘিরে আবর্তিত হয়, তা থেকে সমাজ জীবনে লিঙ্গীয় মতাদর্শের কেন্দ্রীয় ভূমিকা ফুটে ওঠে।

গ্রামীন বাংলাদেশে 'মৌলবাদী' শক্তি এবং পশ্চিমা সাহায্যে পরিচালিত উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্বে নারীদের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠার ব্যাপারটি বিশদভাবে বুঝবার প্রয়াসে এ নিবন্ধে কিছু নির্দিষ্ট ও আন্তঃসম্পর্কিত প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছেঃ

১) কেন এবং কি প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে উন্নয়ন ডিসকোর্স গ্রামীন নারীকে সুনির্দিষ্টভাবে এবং গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যদল হিসাবে নির্মাণ করে? গ্রামীন বাংলাদেশে বিদ্যমান লিঙ্গীয় সম্পর্ক কিভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে ও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়?

২) সাম্প্রতিককালে কোন্ বিশেষ পরিস্থিতিতে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িত নারীরা আক্রমণের শিকার হয়েছে? এই আক্রমণের স্বরূপ কি এবং বিভিন্ন শ্রেণীর স্থানীয় গ্রামীন জনগণ এটাকে কিভাবে দেখছে?

৩) এই যে একদিকে উন্নয়ন সংগঠনগুলো এবং অপরদিকে 'মৌলবাদী'রা নিজ নিজ পন্থায় নারীদেরকে বিশেষ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে, এই প্রেক্ষাপটে নারীরা নিজেরা কিভাবে প্রতিরোধ বা আপোষের মাধ্যমে চলমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে?

উপরের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করার প্রাক্কালে কিছু প্রধান প্রত্যয়ের সংজ্ঞা নিয়ে অন্ততঃ দু'একটি কথা বলে নেওয়া ভাল। প্রথমেই ধরা যাক 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টির কথা। অনেকদিন ধরে এটি দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এই ধারণার যথেষ্ট সমালোচনা ও পুনর্মূল্যায়ন হয়েছে (যেমন, Hobart 1993, Sachs 1992)। উন্নয়নকে উপর থেকে নীচে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাসমূহের (top-down approaches) ব্যাপক ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নের ধারণাকে ঢেলে সাজানোর প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। কাজেই 'উন্নয়ন' কথাটি ব্যবহার করতে গিয়ে আমি এর বিবিধ অর্থ ও প্রয়োগের বিষয়টি মাথায় রাখার চেষ্টা করব। তবে উন্নয়নের বিবিধ পন্থার মধ্যে কোনটি বেশী ভাল, তা নির্ণয় করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং উন্নয়নের কোন নির্দিষ্ট পন্থার সাথে কি কি ধ্যান-ধারণা ও চর্চা জড়িত রয়েছে, এবং সেগুলো কার্যকর করার ফলাফল কি, এসব যাচাই করাই আমার লক্ষ্য।

প্রচলিত ব্যবহারে 'মৌলবাদ' শব্দটি দিয়ে সমকালীন অনেক রাজনৈতিক প্রপঞ্চকে বোঝানো হয় যেগুলোর মধ্যে হয়ত সবক্ষেত্রে কোন সাধারণ অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য নেই। সাধারণভাবে যাদেরকে 'মৌলবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তারা তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াসে 'ঐতিহ্যে'র একটা নির্দিষ্ট ধারণার উপর নির্ভর করে থাকে (দ্রঃ Marty and Appleby 1995), তবে তাদের কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্যাবলী খুব একটা ঐতিহ্যবাহী নয় (দ্রঃ Caplan 1987)। অর্থাৎ সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই 'মৌলবাদী'দের কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্যাবলীকে বুঝতে হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জামায়াতে ইসলামীর মত রাজনৈতিক দল, যারা 'ইসলামী' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে, তাদের মতাদর্শকে বোঝানোর জন্য 'মৌলবাদী' কথাটি সচরাচর প্রয়োগ করা হয়। আরও সাধারণভাবে যেসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী 'গোঁড়া' বা 'রক্ষণশীল' হিসেবে বিবেচিত, তাদেরকেও অনেকসময় 'মৌলবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ নিবন্ধে সাম্প্রতিককালে এনজিও-বিরোধী তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্টদের 'মৌলবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করার রেওয়াজ অনুসরণ করা হলেও তাদের সম্পর্কে কোন পূর্বনির্ধারিত ধ্যান-ধারণা পোষণ করা হয় নি, বরং তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্দেশ্যাবলী কি, তা নির্ধারণ করাই আমার লক্ষ্য।

এ নিবন্ধ মূলতঃ চারটি অংশে বিভক্ত। প্রথমতঃ আমি লিঙ্গ, উন্নয়ন এবং ধর্মের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে গবেষণা-সাহিত্যে কতটুকু লেখালেখি হয়েছে তার পর্যালোচনা করব। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন ডিসকোর্স কি প্রক্রিয়ায় গ্রামীন নারীদের একটি নির্দিষ্ট 'টার্গেট গ্রুপ' হিসেবে নির্মাণ করে এবং বাস্তবিকভাবে বিদ্যমান লিঙ্গীয় সম্পর্ককে কতদূর পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করে সে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে নিরীক্ষণ করব। এর পরে আমি বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে এনজিও ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত নারীদের বিরুদ্ধে যে ধরনের আক্রমণ হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার মাধ্যমে এ ধরনের পরিস্থিতি উদ্ভবে ধর্মীয় মৌলবাদের রাজনীতি কিভাবে বিদ্যমান লিঙ্গীয় মতাদর্শের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া করে তা আলোচনা করব। সবশেষে বিরাজমান দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে নারীরা নিজেরা কিভাবে চলমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে তার পরিধি ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করব।

গবেষণা-সাহিত্যে নারী, উন্নয়ন এবং ধর্ম

গত দুই দশক বা তারও বেশী সময় ধরে নারীবাদী লেখকরা লিঙ্গীয় ইস্যুকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর একাডেমিক ডিসকোর্সের কেন্দ্রে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় এমন একটি ক্ষেত্র হচ্ছে নারী ও উন্নয়ন সংক্রান্ত লেখালেখির একটা বর্ধিষ্ণু ধারা। যেহেতু 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টি ও এর চর্চা এখনো বিশ্বের বিভিন্ন অংশে কর্তৃত্ব করছে, 'উন্নয়ন' বলতে যে সমস্ত ধ্যানধারণা, চর্চা এবং সম্পর্ক বোঝায় সেগুলোকে বোঝার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন লেখালেখিতে লিঙ্গীয় ইস্যুর অন্তর্ভুক্তি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে (যেমন, Afshar 1991; Moser 1993; Kabeer 1994; Marchand and

Parpart 1995)। একইভাবে বর্তমান বিশ্বে লিঙ্গ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক নিয়েও যথেষ্ট লেখালেখি হচ্ছে (যেমন, Yuval-Davis and Anthias 1989; Moghadam 1994; Kandiyoti 1991)। যেহেতু সমকালীন বিশ্বের বহু অঞ্চলে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের কেন্দ্রে ধর্মকে টেনে আনার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে, এ প্রেক্ষিতে লিঙ্গ ও ধর্মের রাজনীতির সম্পর্ক একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপরে উল্লিখিত উভয় বিষয়ের উপর আলাদাভাবে প্রচুর লেখালেখি হলেও লিঙ্গীয় ইস্যু বিবেচিত হোক বা না হোক, সাধারণভাবে উন্নয়ন এবং ধর্মের, এবং বিশেষ করে উন্নয়ন এবং ধর্মীয় মৌলবাদের, মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে গবেষণার পরিমাণ যৎসামান্যই রয়ে গেছে (দ্রঃ Henkel and Stirrat 1996)। যেহেতু উন্নয়ন এবং ধর্ম, এ উভয় বিষয়ই বিভিন্ন দেশে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু হিসাবে বিরাজ করছে, এদের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে কেন তেমন আলোচনা হয়নি তা বেশ বিস্ময়ের ব্যাপার। Ferguson (1994) যে development apparatus-কে anti-politics machine হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, তা দিয়ে এই আপেক্ষিক শূন্যতার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। 'ধর্মীয় মৌলবাদ' হচ্ছে রাজনৈতিক অঙ্গনের একটা বিষয়, অন্যদিকে 'উন্নয়ন' মূলতঃ নির্ভর করে প্রযুক্তি ও অর্থনীতি সংক্রান্ত ডিসকোর্সের উপর, যেখানে 'রাজনৈতিক' ইস্যু নিয়ে আলোচনা করার তেমন কোন অবকাশ নেই।

যাই হোক, ধর্ম তথা ধর্মীয় মৌলবাদের সাথে উন্নয়নের সম্পর্কের প্রতি তেমন দৃষ্টি দেওয়া না হওয়ার পেছনে যে কারণই থাকুক না কেন, এটার অত্যাবশ্যকতার সমর্থনে একাধিক যুক্তি দাঁড় করানো যায়। যেমন, প্রথমতঃ, উন্নয়ন বিষয়ক লেখালেখিতে উন্নয়নের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তার উপর ইদানীংকালে যথেষ্ট জোর দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে ধর্ম যেহেতু সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এর প্রতি উদাসীন থাকার যুক্তি খুবই কম। দ্বিতীয়তঃ, যেমনটা অনেকেই প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ্য করে থাকেন (যেমন, Moser 1993:43), 'তৃতীয় বিশ্বে'র বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার 'ব্যর্থতা' এবং 'ধর্মীয় মৌলবাদে'র উত্থানের মধ্যে পরিস্কার যোগসূত্র আছে বলে প্রতীয়মান হয়। যখন Escobar-এর মত উন্নয়ন-সমালোচকরা প্রস্তাব দেন যে বিকল্প উন্নয়ন (development alternatives) নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল জ্ঞানতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে ত্যাগ করার মাধ্যমে উন্নয়নের বিকল্পের (alternatives to development) ভিত্তিতে চিন্তা করতে হবে (১৯৯১:৬৭৫; ১৯৯৫:২২২-২২৬), তখন প্রশ্ন আসতেই পারে, বিভিন্ন 'মৌলবাদী' আন্দোলনকে কি 'উন্নয়নের বিকল্প' হিসাবে দেখা যেতে পারে? এ প্রেক্ষিতে ধর্মীয় মৌলবাদের সাথে একদিকে ধর্মের, এবং অন্যদিকে 'আধুনিকতা' ও 'উন্নয়ন'-এর সম্পর্ক পরীক্ষা করে দেখা জরুরী। তৃতীয়তঃ, যদিও বর্তমানের অধিকাংশ উন্নয়ন সংস্থাকেই 'ধর্মনিরপেক্ষ' হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে,

কর্মকান্ড ও লক্ষ্যের দিক থেকে তাদের সাথে তাদের পূর্বসূরী বা পাশাপাশি কাজ করে যাচ্ছে এমন অনেক ধর্মভিত্তিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে। উপরে আলোচিত বিষয়গুলোর সবগুলোই ধর্ম ও উন্নয়নের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণের গুরুত্বকেই তুলে ধরে।

ধর্ম ও উন্নয়নের সম্পর্ক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অধ্যয়ন করা গেলেও লিঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার মাধ্যমে তা করার জন্য তাত্ত্বিক ও তথ্যগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র আমরা পাই। এক্ষেত্রে Caroll (১৯৮৩)-এর একটি গ্রন্থকে গবেষণা-সাহিত্যে বিদ্যমান শূন্যতা পূরণের অন্যতম প্রথম প্রয়াস হিসাবে বিবেচনা করা যায়। তবে ধর্মকে তিনি যেভাবে প্রত্যয়িত ব্যবহার করেছেন, এবং নারী ও উন্নয়নের সাথে ধর্মকে সংশ্লিষ্ট করার ক্ষেত্রে তিনি যে ধরনের বিশ্লেষণমূলক কাঠামো ব্যবহার করেছেন, সেগুলোতে সমস্যা রয়ে গেছে। 'প্রতিটি ধর্মেই রয়েছে একটি অন্তর্নিহিত নমনীয়তা' (পৃঃ২৫৩), এধরনের কথা বললেও যে চারটি প্রধান 'ধর্মে'র উপর তিনি আলোচনা করেছেন--হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং ইসলাম--এর যে কোনটির মধ্যে যে বিভিন্ন জটিলতা, বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্য অন্তর্নিহিত রয়েছে, এ বিষয়টি তিনি সম্যকভাবে তুলে ধরতে পারেননি। এছাড়া 'শিক্ষা' এবং 'জনসংখ্যা'র বিষয়ে প্রতিটি ধর্মের অবস্থান কি, তা পালাক্রমে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি 'উন্নয়ন'-এর ধারণাকে অপরীক্ষিতই রেখে দিয়েছেন। একইভাবে লিঙ্গের প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য বেশ সরল ধরনেরই থেকে গেছে। তিনি বলেন, নারীরা যে অবস্থানে রয়েছে তার জন্য ধর্ম নয়, বরং অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ধর্মে পুরুষদের একচ্ছত্র ক্ষমতাই হল দায়ী।

নারী ও উন্নয়ন সংক্রান্ত লেখালেখি বিশদভাবে পর্যালোচনা করলেও মূলতঃ উপরোল্লিখিত ধরনের ধারণাই বেশী পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। যেমনটা বাংলাদেশে নারী ও উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণার পর্যালোচনা করতে গিয়ে Sarah White (১৯৯২:১৭) লক্ষ্য করেছেন, যেসমস্ত বিরল ক্ষেত্রে ধর্মের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, সেগুলোতে ধর্মকে মোটা দাগে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিষয় হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে। তবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'পুরুষ কর্তৃত্বে'র মতাদর্শগত উৎস হিসাবে ধর্মকে ঢালাওভাবে চিহ্নিত করার সাধারণ প্রবণতার বিপরীতে অনেক সমকালীন নারীবাদীই কর্তৃত্বশীল ধর্মীয় ঐতিহ্যসমূহের মধ্যে লুকিয়ে থাকা নারীদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিষয়ক সূত্রগুলো তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছেন (White, পূর্বোক্ত:১৪৯)। ধর্মীয় ঐতিহ্যের নারীবাদী পুনর্ব্যাখ্যাসমূহ (দ্রঃ King ১৯৯৫) এখনও উন্নয়ন ক্ষেত্রে দৃশ্যত কোন প্রভাব ফেলতে না পারলেও আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহ অবশেষে নারী ও উন্নয়নের প্রেক্ষিতে ধর্মের প্রতি অধিকতর মনোযোগ নিবদ্ধ করতে শুরু করেছে, এমন কিছু আলামত পাওয়া যায় (যেমন, Special Programme on Women and Development ১৯৯৩)। তবে এসব ক্ষেত্রে অন্য যে কোন ধর্মের চাইতে ইসলামই যে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বলে প্রতীয়মান হয়, এ

বাস্তবতার আলোকে যেসব কারণে পাশ্চাত্যে ইসলামের উপস্থাপনা একটি গোলমেলে বিষয়, সেসবের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটটাও হিসেবে রাখা জরুরী। অন্যদিকে এটাও লক্ষ্যণীয় যে, 'ইসলাম' ও 'উন্নয়ন'-এর মধ্যকার কথিত অসঙ্গতি সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা দূর করতে গিয়ে লেখা এসমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক দলিলপত্রে উন্নয়নের ধারণাকে প্রশ্নাতীতই রেখে দেওয়া হয়েছে।

উন্নয়নের টার্গেট ঃ বাংলাদেশের গ্রামীন নারী

বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে (রাষ্ট্র, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, এবং অসংখ্য দেশী বিদেশী এনজিও) সবগুলোর না হোক অধিকাংশেরই বর্তমানে একটি অভিন্ন ঘোষিত লক্ষ্য রয়েছে, 'নারীর উন্নয়ন'। 'দরিদ্র গ্রামীন নারীরা' নিজেরা 'উন্নয়ন' চাক বা ন চাক, এ লক্ষ্যের কাম্যতা নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান মোটামুটি নিঃসন্দেহই বলা চলে। তবে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে 'দরিদ্র গ্রামীন নারীদের' কাছে উন্নয়নের যতটা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তার চেয়ে উন্নয়ন সংগঠনগুলোর কাছে দরিদ্র গ্রামীন নারীদের প্রয়োজনই বেশী। একথা বলার অর্থ এই নয় যে, যে পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের 'দরিদ্র গ্রামীন নারীরা' (বা পুরুষরা) বাস করছে সেটাকে তারা পছন্দ করে, কিন্তু তাদের মঙ্গল নিয়ে 'চিন্তিত' বিভিন্ন সংগঠন যেভাবে দ্রুত গজিয়ে উঠেছে সেটাকে কখনই দরিদ্র নারীদের তরফ থেকে আসা সাহায্যের আবেদনের প্রতি সরাসরি সাড়া হিসাবে দেখা যায় না। বরং বিভিন্ন বিদেশী সাহায্য সংস্থা এবং আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংগঠন (যেমন জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক) কর্তৃক আরোপিত শর্তের আলোকেই 'নারীর উন্নয়ন'-এর ব্যাপারে আগ্রহের এই বিস্তারকে ব্যাখ্যা করতে হবে। অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্য 'নারীর উন্নয়ন' বিষয়টি তহবিলের নিত্যনূতন উৎসের সন্ধান পাওয়ার একটি উপায় ছাড়া বড় কিছু হয়ত নয়। অবশ্য একথাও সত্য যে এমন অনেক ব্যক্তি ও সংগঠন আছে যারা হয়ত 'দরিদ্র গ্রামীন নারীরা' যে পরিস্থিতিতে বাস করে তার উন্নয়নের ব্যাপারে সত্যিকারভাবে আগ্রহী, ঠিক যেভাবে এই নারীরা নিজেরাও হয়ত তাদের চারপাশে অনেক পরিবর্তন দেখতে আগ্রহী হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায় কোন ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে? আর কিভাবে ও কাদের দ্বারা কাঙ্খিত পরিবর্তনগুলো সাধিত হবে? এই ইস্যুগুলো বাংলাদেশের উন্নয়ন ডিসকোর্সে কিভাবে আলোচিত হয়েছে তার উপর আমি এখন দৃষ্টি দিচ্ছি।

উন্নয়ন ডিসকোর্সে বাংলাদেশের 'দরিদ্র গ্রামীন নারী'

বাংলাদেশের নারীদের উপর বিভিন্ন লেখালেখির পর্যালোচনা করতে গিয়ে White (১৯৯০:৯৭) লক্ষ্য করেছেন যে প্রায় সব কাজেই উন্নয়নের প্রসঙ্গ কোন না কোনভাবে জড়িয়ে আছে। যেমনটা প্রত্যাশিত, এসব কাজের অধিকাংশই (অন্ততঃ যে সব প্রবন্ধ ও বই প্রধান রেফারেন্স হিসেবে কাজ করে) পাশ্চাত্যের বা পাশ্চাত্য-প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লেখা, যেগুলো সচরাচর উন্নয়ন সংস্থাসমূহ কর্তৃক সৃষ্ট চাহিদা এবং তাদের আর্থিক সহায়তার ভিত্তিতেই উৎপাদিত হয়ে

থাকে। কাজেই এটা অবাক করার কোন বিষয় নয় যে উন্নয়নের বৈশ্বিক ডিসকোর্সে যেসব প্রবণতা দেখা যায়, বাংলাদেশের নারী ও উন্নয়নের উপর লেখা বিভিন্ন কাজেও সেগুলোর প্রতিফলন পাওয়া যায়। এ প্রেক্ষিতে 'তৃতীয় বিশ্বের নারী'র যে সাধারণ চিত্র দাঁড় করানো আছে, তার আদলেই আমরা 'বাংলাদেশের নারী'কেও দেখতে পাই। একইভাবে দেখা যায়, বাংলাদেশের নারীদের উপর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রভাব সংক্রান্ত কোন বক্তব্য হয়ত নারী ও উন্নয়ন সংক্রান্ত একটা বৈশ্বিক ডিসকোর্সেরই আলোকেই দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে নারী ও উন্নয়ন নিয়ে লেখালেখির মধ্যে White (১৯৯০:৯৮-১০১) চার ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গীর একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে Abdullah (১৯৭৪)-র কাজ, যে অনুযায়ী উন্নয়নকে একটি 'ভাল বিষয়' হিসেবে দেখা হয়, এবং এর সুফল যাতে নারীরাও ভোগ করে, তাদের জীবন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তারা যেন এ থেকে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী নারীরা হচ্ছে 'অদৃশ্য সম্পদ', যাদের উপেক্ষা করার কারণে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে বলে বলা হয় (দ্রঃ Wallace et al. ১৯৮৭)। তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গী, যার প্রতিনিধিত্ব করেন Lindenbaum (১৯৭৪), হল এই যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়া সচরাচর বিদ্যমান শ্রেণী বৈষম্যকে বাড়িয়ে দেয় এবং এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা তৈরী করে। এটা ধরে নেওয়া হয় যে এসবের প্রভাব বিশেষ করে নারীদের জন্য বেশী নেতিবাচক হয়ে থাকে, যা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে তাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচী নেওয়া দরকার। সবশেষে, চতুর্থ দৃষ্টিভঙ্গীটা সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরও বেশী সমালোচনার চোখে দেখে (যেমন, McCarthy 1984)। এ অনুযায়ী নারীদের জন্য নেওয়া বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচীগুলো মূলতঃ শোষণমূলক, এবং এটা বলা হয় যে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা বৈপরীত্য দাঁড় করার মাধ্যমে 'টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচ'-এর 'পৃথক কিন্তু সমান' এই দর্শন গ্রামীন অঞ্চলে শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতির ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। এ যুক্তিও দেওয়া হয় যে, বিভিন্ন আর্থসামাজিক সমস্যার উপর লিঙ্গীয় দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করার মাধ্যমে হয়ত এদের আসল প্রকৃতিকেই আড়ালে রাখা হয়, কারণ সমস্যাগুলো মূলতঃ লিঙ্গ-সম্পর্কিত নাও হতে পারে।

White যদিও নিজে এটা সরাসরি বলেন নি, তিনি যে সমস্ত লেখার পর্যালোচনা করেছেন সেগুলো নারী ও উন্নয়ন লিটারেচারের বিভিন্ন পর্ব বা 'স্কুল'-এর আওতায় পড়ে। যেমন উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটা স্পষ্টতঃই WID (women in development) ডিসকোর্সের আওতায় পড়ে। একইভাবে পরের দৃষ্টিভঙ্গী মূলত WID থেকে WAD (women and development) ও GAD (gender and development)-এর উত্তরণকেই প্রতিফলিত করে। একইসাথে এটিও বেশ স্পষ্ট যে White নিজেও উন্নয়ন ও নারী সম্পর্কিত বৃহত্তর ডিসকোর্সসমূহের নিরিখেই লেখাগুলোর পর্যালোচনা করেছেন। এমনটা হতে পারে

যে এক্ষেত্রে তিনি হয়ত অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা অতি-সরলীকৃত করে উপস্থাপন করেছেন, তথাপি যে কাজটি তিনি হাতে নিয়েছেন তা নিশ্চিতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বাংলাদেশের 'দরিদ্র গ্রামীন নারীরা' কি অবস্থায় বাস করে তা নিরূপণ করার জন্য অনেক গবেষণাই হয়েছে, কোন প্রেক্ষিতে এসব গবেষণা হচ্ছে, 'জ্ঞান' তৈরী হচ্ছে, সে বিষয়টিও যে তলিয়ে দেখা দরকার তা মূলতঃ খুব সাম্প্রতিক কালেই গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতে শুরু হয়েছে।

গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে নারী ও উন্নয়ন বিষয়ক লেখালেখিতে কি কি অনুমান, উদ্দেশ্য, উহ্যতা প্রভৃতি ধরা পড়ে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে উপরের বক্তব্যগুলো বোঝা যাবে। যেমন, মোটামুটিভাবে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কালে বেশ কিছু সাধারণ জরীপ চালানো হয়েছিল, যেগুলোর উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী নারীদের জীবন সম্পর্কে যে অজ্ঞতা রয়েছে বলে ভাবা হত তা দূর করা (White ১৯৯০: ১০১)। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন অঞ্চল বা অর্থনৈতিক শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পরিবর্তে এসব কাজ ছিল মূলতঃ সাধারণ বক্তব্যনির্ভর, ফলে 'বাংলাদেশের নারী' সম্পর্কিত 'জ্ঞান' তৈরির ক্ষেত্রে এগুলোর মূল অবদান ছিল 'বাংলাদেশের নারী' এই সাধারণ ক্যাটাগরিটি নির্মাণ করা। এ প্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়, তা হল, কারা কোন্ উদ্দেশ্যে এ ধরনের 'জ্ঞান' তৈরি করছে? আর, যেমনটা White উল্লেখ করেছেন, নারীদের জীবন যে অজানা রয়ে গেছে এই ধারণাটাও বেশ কৌতুহলোদ্দীপক (পূর্বোক্ত)। এই ধারণাটা এখনও বহাল রয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, *The Fifty percent: Women in Development and Policy in Bangladesh* (Khan 1988) শীর্ষক একটি গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রামীন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ইউনুস লিখেছেন, 'যখন আমাদের সমাজের বাকী অর্ধেক অংশ (অর্থাৎ নারী) সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের প্রসঙ্গ আসে, বিষয়টা চাঁদের অন্য অংশ সম্পর্কে জানার মত--আমরা জানি যে এটির অস্তিত্ব আছে, কিন্তু এ সম্পর্কে আরও বেশী কিছু জানার আগ্রহ আমাদের কখনও হয়নি' (মূল ভাষ্যটি White 1990:101-এ ইংরেজীতে উদ্ধৃত)। এটা হতেই পারে যে 'আমরা' 'অন্য অংশ'টি সম্পর্কে যথেষ্ট জানি না, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই 'আমরা' কারা? এবং কেনইবা 'আমরা' হঠাৎ করে 'অন্য'দের সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছি? আর এই 'জানা'র অর্থ কি?

স্পষ্টতঃই শ্রেণী এবং লিঙ্গের মত বিষয় 'জ্ঞান' তৈরি এবং ব্যবহারের মধ্যে জড়িয়ে আছে। আর তাই 'বাংলাদেশের দরিদ্র গ্রামীন নারী' এই ক্যাটাগরিটির নির্মাণও নির্ভর করছে অসমতার বিভিন্ন পরস্পরযুক্ত কাঠামোর প্রেক্ষিতে, যেগুলো বৈশ্বিক, জাতীয়, স্থানীয় ও গার্হস্থ্য পর্যায়ে কাজ করছে। উন্নয়ন ডিসকোর্সের মাধ্যমে এই নারীদের সম্পর্কে আমরা যা জানতে পারি তা হল পরিসংখ্যানগত তথ্যের একটি যৌগিক চিত্র। এসব তথ্য যদি বেশ বিস্তারিত হয়ও, পুরো চিত্রটা বিমূর্তই রয়ে যায়। আর গবেষণার জন্য কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নজর দেওয়া হচ্ছে সেগুলোও মোটামুটি আগে থেকে বলে দেওয়া যায়। যেমন দেখা যায় এই

কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের (দরিদ্র গ্রামীন) নারীদের নিয়ে যত গবেষণা হয়েছে তার অধিকাংশই ছিল 'অর্থনৈতিক কর্মকান্ড', 'প্রজনন-ক্ষমতা', 'মর্যাদা', 'পর্দা' প্রভৃতি বিষয়ের উপর (White ১৯৯২: ১০১-১০২ দ্রঃ)। যে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এ ধরনের বিষয়ের উপর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে তা বেশ স্পষ্ট। যেমন, 'প্রজনন-ক্ষমতা' (fertility) গবেষণার একটি প্রধান বিষয় রয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে রাষ্ট্র তথা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ' এখনও একটা বড় ধরনের চিন্তার বিষয়, আর এক্ষেত্রে 'দরিদ্র গ্রামীন নারী'দের শরীরেই এ সমস্যার চূড়ান্ত উৎস নিহিত রয়েছে বলে ভাবা হয়।

যাই হোক, আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে বেশ কিছু 'নূতন' বিষয়ের উপর কাজ হয়েছে, যেমন যৌতুক, পতিতাবৃত্তি, নারী নির্যাতন, লৌকিক ধর্ম প্রভৃতি। আর এই সময়ে উন্নয়নের বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপরও আরও বেশী গভীর এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে (White, পূর্বোক্ত: ১০২-১০৩)। তথাপি নারীর সক্রিয়তা (agency), তাদের সৃজনশীলতা, সংগ্রামের ক্ষমতা, আশা আকাঙ্খার উপর দৃষ্টি দিয়েছে, এমন কাজ এখন পর্যন্ত সংখ্যায় খুব অল্পই রয়ে গেছে। এর পরিবর্তে আমরা এখনও আভক্ষধড় ভশ ত ইতফন (Adnan ১৯৮৯) জাতীয় শিরোনামের দেখা পাই, যেগুলোয় বাংলাদেশের 'দরিদ্র গ্রামীন নারী'দের নিষ্ক্রিয় (passive) ভূমিকাতেই তুলে ধরা হয়। এসব নারীদের বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে যে ধারণা উন্নয়ন ডিসকোর্সে ব্যাপক ভাবে চালু রয়েছে বলে মনে হয়, তারই একটা প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই উক্ত গ্রন্থের উপসংহারে: "While the figurative cage circumscribing women's existence has begun to show signs of breaking up, it is yet to be prised open" (পূর্বোক্ত: ১৭)। এখানে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে মনে হয় যে নারীরা নিজেরা খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসতে অক্ষম, তাই খাঁচাটা বাইরে থেকে খুলে দিতে হবে। এই 'খাঁচা খুলে দেওয়া'র কাজটা যেভাবে করা হচ্ছে, তার একটা বিশেষ পন্থার দিকে এখন আমি নজর দেব, তা হল, 'দরিদ্র গ্রামীন নারী'দের জন্য ঋণের ব্যবস্থা।

'ঋণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন'-এর ডিসকোর্স

দীর্ঘদিন ধরে নারীদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হলেও গ্রামীন ঋণ প্রদান কর্মসূচীগুলো নারীদের অংশগ্রহণের জন্য একটা নূতন ক্ষেত্র তৈরি করেছে। এক্ষেত্রে গ্রামীন ব্যাংকের 'সাফল্য' এখন বিশ্বব্যাপী সুবিদিত, এবং একই মডেল দেশে বিদেশে অন্যান্য অনেক সংগঠন অনুসরণ করছে। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত গ্রামীন ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থাগুলো তাদের বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় নারীদের চেয়ে পুরুষদেরই বেশী সংখ্যায় রেখেছিল। অন্যদিকে গ্রামীন ব্যাংক দৃষ্টি দিয়েছে ভূমিহীন মহিলাদের দিকে, ঋণ শোধের ব্যাপারে যাদের উপর অনেক বেশী ভরসা করা যায় বলে দেখা গেছে, এবং বর্তমানে অন্যান্য প্রায় সব প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ কর্মসূচীর

তুলনায় গ্রামীন ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের হার উচ্চতর। গ্রামীন ব্যাংকের এই সাফল্য দেখে অন্যান্য অনেক সংগঠনই একই ধরনের কর্মসূচী চালু করেছে, অর্থাৎ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে পুরুষদের চাইতে নারীদেরকেই তারা অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

গ্রামীন ব্যাংকের পন্থা যে সফলতা দেখিয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবে প্রশ্ন করা যায়, এই 'সফলতা'র প্রকৃতি কি? ঋণ পরিশোধের হার দিয়ে 'সফলতা' পরিমাপ করা হলে এক ধরনের উত্তর মিলবে, কিন্তু যখন আমরা 'দারিদ্র্য দূরীকরণ' ও 'ক্ষমতায়ন'-এর মত মাপকাঠি ব্যবহার করি তাহলে উত্তর হবে ভিন্ন। এটা সত্য যে উন্নয়ন ডিসকোর্সে বর্তমানে 'দারিদ্র্য দূরীকরণ' (eradication of poverty) কথাটা খুব একটা ব্যবহার করা হয় না। এর পরিবর্তে 'দারিদ্য লাঘবীকরণ' (alleviation of poverty)-এর উপরই এখন বেশী জোর দেওয়া হয়। যাই হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত দারিদ্রের হার বাড়তেই থাকবে, যদি বিশেষ ঋণ কর্মসূচীগুলো যৎসামান্য সাহায্য হলেও দরিদ্রতম মানুষদের কাছে পৌছে দিতে পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে অর্জিত 'সফলতা' নিয়ে তেমন কোন প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকে না। কিন্তু একই সাথে এই 'সফলতা'কে দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর পাশাপাশি আর একটা ইস্যু এই নিবন্ধের পরিসরে আরও বেশী প্রাসঙ্গিক, সেটা হল, 'ঋণ' ও 'ক্ষমতায়ন'-এর মধ্যে সমীকরণ টানা (Hashemi et al. 1996 দ্রঃ)। এই বিষয়কে সামনে রেখেই এখানে আমি 'উন্নয়ন'-এর গ্রামীন মডেলের 'সাফল্য' নিয়ে আলোচনা করব।

লিঙ্গীয় বৈষম্যের সাথে মোকাবেলার জন্য ঋণ নয়, বরং সামাজিক এবং কাঠামোগত বিষয়ের উপরই বেশী জোর দিতে হবে, এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রত্যুত্তরে হাশেমী ও অন্যান্যরা (Hashemi et al. ১৯৯৬:৬৩৬) দাবী করেছেন যে 'ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী আসলেই নারীদের ক্ষমতায়িত করে'। কিন্তু তাদের 'ক্ষমতায়ন'-এর সংজ্ঞা বেশ সংকীর্ণ। এ সংজ্ঞা তাঁরা কোথাও সরাসরি না দিলেও তা কয়েকটা প্রেক্ষিত থেকে বের করে আনা যায়। যেমন গ্রামীন ব্যাংক ও ব্র্যাকের ঋণ কর্মসূচীর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁরা এক জায়গায় লিখেছেন, 'নারীদের বাড়ি থেকে টেনে বের করে এনে এবং তাদের অর্থনৈতিক ভূমিকা দৃঢ়তর করে ক্ষমতায়িত করার মাধ্যমে উভয় কর্মসূচীই সামাজিক পরিবর্তনে অবদান রাখছে বলে ধারণা করা হয়' (পূর্বোক্ত:৬৩৭)। এখানে 'নারীদের বাড়ি থেকে টেনে বের করে আনা'র উপমা স্পষ্টতঃই 'ক্ষমতায়ন' শব্দটির অর্থকে সীমিত করে দেয়। প্রশ্ন আসে, নারীরা যদি নিজেদের উদ্যোগ ও সিদ্ধান্তেও বাড়ি থেকে 'বের হয়ে' আসত, শুধু এটুকু পদক্ষেপ থেকেই কি তাদের আরও বেশি 'ক্ষমতায়িত' হিসেবে চিহ্নিত করা যেত? আর কোন্ অর্থে নারীদের অর্থনৈতিক ভূমিকা দৃঢ়তর হচ্ছে? সবচেয়ে বড় কথা, ঋণ কর্মসূচীতে অংশ নেওয়ার ফলে নারীদের কোন অবস্থানগত পরিবর্তন হয়ে থাকলে সেটাকে তারা নিজেরা কিভাবে দেখছে? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার সবচেয়ে যৌক্তিক পন্থা নিঃসন্দেহে হবে সংশ্লিষ্ট নারীদেরকেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করা। তবে যেভাবে ঋণ পাওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে তাদেরকে 'ষোল

সিদ্ধান্ত' মুখস্থ করে নিতে হয়, তাতে করে এটা অসম্ভব কিছু নয় যে তাদের কোন প্রশ্ন করা হলে তারা এসব আরোপিত ধ্যান-ধারণা মাপকাঠির ভিত্তিতেই উত্তর দেবে। এক্ষেত্রে যে সব জটিলতা থেকে যায়, সেগুলোর মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য আমরা সেসব জরীপের উপর নির্ভর করতে পারি না যেগুলো কিছু 'সূচক' (indicators)-এর ভিত্তিতে ক্ষমতায়নকে 'মাপতে' চেষ্টা করে (দ্রঃ পূর্বোক্ত)।

অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে তুলনামূলকভাবে বেশী লিঙ্গীয় সমতা আসে কিনা, এ নিয়ে নারীবাদীদের মধ্যে বেশ কিছু সময় ধরে বিতর্ক চলে এসেছে। এ প্রসঙ্গে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ বা তাদের মজুরী অর্জনের অর্থ এই নয় যে তাদের শ্রমের ফসলের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে (Whitehead 1981)। ঋণ পাওয়ার পর প্রাপ্ত অর্থের উপর নারীদের নিয়ন্ত্রণ আসলে কতটুকু থাকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে Goetz ও Sen Gupta (1995:45) জানিয়েছেন যে, 'নারীদের পাওয়া ঋণের টাকার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের পুরুষ আত্মীয়রা খাটায়, যদিও ঋণ শোধ করার দায়ভার নারীদেরই নিতে হয়'। কিছুটা ভিন্ন প্রেক্ষিতে এরকম কথা উঠেছে যে নারীদের জন্য ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হওয়ার একটা কারণ হল, এটা দেখা গেছে যে নারীদের মধ্যে তাদের নিজেদের চাইতে পরিবারের উন্নতির জন্যই ঋণের অর্থ ব্যবহার করার প্রবণতা বেশী (Kabeer 1995:115)। কাজেই এধরনের বিষয় যখন বিবেচনায় নেওয়া হয়, তখন 'ক্ষমতায়ন'-এর ব্যাখ্য ক্রমশঃ আরও দুরূহ হয়ে ওঠে।

যেহেতু 'ক্ষমতায়ন' একটি সম্পর্ক-নির্ভর প্রত্যয় (relational concept), এ প্রশ্ন করাও জরুরী, কাদের বা কিসের তুলনায় কেউ ক্ষমতায়িত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে এ তথ্যটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ যে নারী ঋণগ্রহিতারা গ্রামীন ব্যাংক কর্মীদের (যাদের বেশীর ভাগই পুরুষ) সচরাচর 'স্যার' বলে সম্বোধন করে থাকে, যা স্পষ্টতঃই একটা অসম সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। বিষয়টি লক্ষ্য করার পরও হাশেমী ও তাঁর সহলেখকরা দাবী করেন যে, একটা শ্রেণীবিভক্ত কাঠামোর মধ্যে থেকেই এবং প্রচলিত অসম সামাজিক সম্পর্কের ধারা অনুসরণ করে গ্রামীন ব্যাংক নারীদের ক্ষমতায়িত করে। কিন্তু এক্ষেত্রে 'ক্ষমতায়ন' প্রত্যয়টির অর্থ অত্যন্ত সীমিত ও অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। অবশ্য হাশেমী ও তাঁর সহলেখকরা এটা স্বীকার করেন যে গ্রামীন ব্যাংক নারীদেরকে 'পিতৃতন্ত্রে'র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামানোর চেষ্টা করছে না। তাঁরা বলেন, সে উদ্দেশ্যে নারীদের সংগঠিত করতে হলে যে ধরনের সাংগঠনিক পন্থা দরকার, ঋণ কর্মসূচীগুলো (এগুলো সরাসরি লিঙ্গীয় ইস্যুকে সামনে রেখে হাতে নেওয়া হোক বা না হোক) সে পন্থা হতে পারে না (পূর্বোক্ত:৬৫১)।

ক্ষমতায়নের মাত্রা ও অর্থ নির্ণয় করা দুরূহ হলেও গ্রামীন ব্যাংক যে 'বিপুল সংখ্যক দরিদ্র নারী'র কাছে পৌঁছাতে পেরেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে বিপুল সংখ্যক লোককে কোন কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার অর্থ তাদেরকে ক্ষমতায়িত করা নয়। এটির অর্থ যা তা হল, একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিস্তার। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিস্তারই গ্রামীন

ব্যাংক ও ব্র্যাকের মত সংস্থার জন্য সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে ধারণা করা যায়। একজন গবেষক (Ebdon ১৯৯৪) জানিয়েছেন যে একটা গ্রামে মাঠকর্ম চালিয়ে তিনি দেখতে পান যে গ্রামীন ব্যাংক ও ব্র্যাক ওই গ্রামের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত একটা ক্ষুদ্রতর ও অপ্রতুল আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত এনজিওর কর্মক্ষেত্রে জোর করে ঢুকে পড়ছিল। এটা লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে এসমস্ত সংস্থার মাঠকর্মীরা ঋণ বিতরণের কিছু পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য দ্বারা তাড়িত ছিল। ফলে 'আরও বেশী ও আরও ভাল' ঋণ দেওয়ার কথা বলে তারা নারীদের স্থানীয় এনজিওর আওতা থেকে সরে যেতে প্রলুব্ধ করেছিল। ঋণ বিতরণের আগে গ্রামীন ব্যাংকের লোকজন এই গ্রামে মাত্র একবার এসেছিল, এবং ঋণ গ্রহিতাদের জন্য তারা একটাই শর্ত আরোপ করেছিল যে তাদেরকে 'ষোল সিদ্ধান্ত' মুখস্থ করতে হবে। এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে বটে, কিন্তু একথাও সত্য যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিস্তারের জন্য বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে রীতিমত একটা প্রতিযোগিতা চলছে। এ প্রেক্ষিতে এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, গ্রামীন ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থা যে উদ্দেশ্যেই নারীদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়ে থাকুক না কেন, এসব কর্মকান্ডের চূড়ান্ত ফলাফল হয়ত দাঁড়ায় Ferguson (১৯৯৪)-বর্ণিত 'বিরাজনীতিকীকরণ' (depoliticization) প্রক্রিয়ার মতই।

পর্দা, দারিদ্র্য ও ক্ষমতা

উন্নয়ন ডিসকোর্সে বাংলাদেশের গ্রামীন নারীদের এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন তাদের জন্য 'উন্নয়ন' আমদানী হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা পর্দার অন্তরালে অনুৎপাদশীল জীবন কাটাচ্ছিল। তবে তথ্য প্রমাণ ভিন্ন কথা বলে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র পরিসর জরীপ থেকে দেখা গেছে যে গ্রামীন নারীদের জোগান দেওয়া শ্রম ও কার্য ঘন্টা পুরুষদের তুলনায় বেশী না হলেও অন্ততঃ সমান। তবে তাদের কার্যদিবসের একটা বড় অংশ ব্যয় হয় পারিশ্রমিকবিহীন উৎপাদনশীল কাজে, যার মধ্যে রয়েছে গৃহস্থালীর কাজ (যেমন রান্নাবাড়া, ধোয়ামোছা, শিশুদের যত্ন নেওয়া), পরিবারের বিভিন্ন প্রাথমিক চাহিদা মেটানো (যেমন জ্বালানী, পশুখাদ্য ও পানি সংগ্রহ করা), এবং পরিবারের বাজারমুখী উৎপাদনে বিনা মজুরীতে সহায়তা করা। এদিকে পারিশ্রমিকবিহীন কার্যাবলীর যথেষ্ট চাহিদা থাকলেও ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন (বিশেষ করে কৃষিতে) প্রভৃতি কারণে নারীরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় মজুরিতে নামছে বা নিজেদের অন্য কাজে নিয়োগ করছে (Jahan ১৯৮৯:৪ দ্রঃ)। নারীদেরকে 'পর্দা'র বাইরে নিয়ে আসার উদ্যোগ নিতে গিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন ডিসকোর্সে যে বিষয়টা খেয়ালে রাখা হয় না তা হল, গ্রামীন বাংলাদেশের সর্বত্র ভূমিহীনতা ও দারিদ্র্যের বিস্তারের ফলে নারীরা এমনিতেই দিন মজুরিসহ আয়ের বিভিন্ন পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

বাংলাদেশের পোশাক তৈরীর কারখানাসমূহে নারী শ্রমিকের অভ্যুদয় এক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। সত্তর ও আশির দশকে বিপুল সংখ্যক রপ্তানীমুখী গার্মেন্টস কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেগুলোতে কাজ করার জন্য অভূতপূর্ব

সংখ্যক নারী গ্রাম থেকে শহরে এসেছে। এক্ষেত্রে বৈশ্বিক ধনতন্ত্রের কার্যপ্রণালী এবং নারীকে শ্রমের 'শস্তা, অনুগত ও সহজে পরিত্যাজ্য' উৎস হিসেবে দেখার মতাদর্শিক প্রয়াস প্রতিফলিত হয় (Kabeer 1991b)। এর পাশাপাশি অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে গ্রামীন নারীদের কর্মসংস্থানের সনাতনী ক্ষেত্রগুলো সংকুচিত হয়ে যাওয়াও এই পরিবর্তনের একটা কারণ বলে মনে হয়। অর্থাৎ 'দরিদ্র গ্রামীন নারী'র ক্ষমতায়নের ডিসকোর্স নয়, বরং দারিদ্র্যই বিভিন্ন নূতন ধরনের শ্রমে নারীর 'দৃশ্যমান' হওয়ার পেছনে বহুলাংশে দায়ী।

লিঙ্গীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এসব পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব কি হবে তা অবশ্য এখনও অস্পষ্ট। কৃষক সমাজের বিভাজনের চলমান প্রক্রিয়ার ফলে আগামী দিনগুলোতে জীবিকার তাগিদ মেটানোর চাপ আরও বৃদ্ধি পাবে, এটা ধরে নিয়ে আদনান বলেছেন যে এতে করে সম্ভবতঃ আরও বহু সংখ্যক নারী 'পর্দা ও পিতৃতন্ত্রের বন্ধন' ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে, এবং তারা হয়ত নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাবে (Adnan1989:17)। এরকম 'আশাবাদ' অবশ্য কিছুটা প্রশ্নসাপেক্ষ, কারণ শ্রমিক হিসেবে নারীর অধিকতর 'দৃশ্যমানতা' মানেই তাদের জন্য অধিকতর 'স্বাধীনতা' নয়। বরং, এটা দেখা গেছে যে গ্রামীন নারীদের কারখানা শ্রমিকে রূপান্তরের প্রক্রিয়া লিঙ্গীয় সম্পর্কে আমূল কোন পরিবর্তন ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে। এর পরিবর্তে কারখানার চৌহদ্দির মধ্যেই নারী-পুরুষের পূর্বেকার সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখা গেছে (দ্রঃ Siddiqi ১৯৯১)। এসব পর্যবেক্ষণের আলোকে দারিদ্র্যের ফলে লিঙ্গীয় সমতা বৃদ্ধি পাবে, এমন ধারণা বিভ্রান্তিকরই মনে হয়। স্পষ্টতঃই গ্রামীন নারীর অধিকতর 'দৃশ্যমানতা'কে এককভাবে তার অপেক্ষাকৃত বেশী 'ক্ষমতায়িত' অবস্থার পরিচায়ক হিসেবে দেখা যায় না।

বাংলাদেশে এনজিও-বিরোধী 'মৌলবাদী' তৎপরতা

আশির দশক থেকে শুরু করে বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক এনজিও আত্মপ্রকাশ করেছে, যা সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন জগতে ঘটে যাওয়া পরিবর্তসমূহকেই প্রতিফলিত করে। আক্ষরিক অর্থে এনজিও (non-governmental organizations) অর্থাৎ বেসরকারী সংস্থাসমূহের অস্তিত্ব দেশে বরাবরই ছিল। কিন্তু 'এনজিও' কথাটার ব্যবহার উন্নয়ন ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল বিধায় 'এনজিও' আর 'উন্নয়ন'-এর মধ্যেকার যোগসূত্র বাংলাদেশে (হয়তবা অন্যত্রও) সহজাতই মনে হয়। অর্থাৎ কার্যতঃ 'এনজিও' বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে এমন যে কোন বেসরকারী সংগঠন যা কোন না কোনভাবে 'উন্নয়ন' খাতে সক্রিয় রয়েছে।

শুরু থেকেই এনজিওদের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি বাংলাদেশে যথেষ্ট বিরোধিতার জন্ম দিয়েছিল। প্রাথমিকভাবে 'বাম' শিবিরের বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিই 'এনজিও মডেল'-এর ক্রমবর্ধমান প্রসিদ্ধির বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার ছিল। তৃণমূল পর্যায়ে কৃষকদের মধ্যে কর্মরত বাম রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ এনজিওদের প্রসারকে দেখেছিল গ্রামীন প্রলেতারীয় শ্রেণীকে বিভক্ত করার একটা কৌশল হিসেবে।

সুতরাং এনজিওগুলোকে 'পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের দোসর' হিসেবে ধিক্কার জানানো হত। আরও সামপ্রতিককালে 'মৌলবাদী' হিসেবে বর্ণিত যারা এনজিও-বিরোধী আন্দোলনে নেমেছে, তারাও 'এনজিও' ও 'পাশ্চাতে'র মধ্যে একই ধরনের সমীকরণ টেনেছে বলে মনে হয়। বিভিন্ন 'পশ্চিমা' উন্নয়ন সংস্থা যেভাবে এনজিওদের গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে, তাতে এরকম সমীকরণে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কাজেই এনজিওদের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক আক্রমণগুলোকে 'পাশ্চাত্যে'র বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে দেখা সম্ভব। তবে এমন কোন উপসংহার টানার আগে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো আরও কাছ থেকে যাচাই করা জরুরী, যে চেষ্টা আমি এখানে করছি।

'এনজিও' কি?

বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে 'এনজিও' একটি সুপরিচিত শব্দে পরিণত হয়েছে। উন্নয়ন মহলে শব্দটির একটা নির্দিষ্ট অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু প্রাত্যহিক ব্যবহারে বাংলাদেশে শব্দটির একাধিক অর্থ ও ব্যঞ্জনা রয়েছে বলে মনে হয়। যেমন, চাকরি খুঁজছে এমন শিক্ষিত তরুণ তরুণীদের কাছে 'এনজিও' বলতে হয়ত নেহাৎই কর্মসংস্থানের একটা সম্ভাব্য ক্ষেত্র বোঝায়। আর গ্রামের মানুষরা যখন 'এনজিও' শব্দটা শোনে বা ব্যবহার করে, তাদের বেশীর ভাগই নিশ্চয় শষশ-ফষৎনক্ষশলনশঢ়তর যক্ষফতশভ।তঢ়ভষশ কথাটা মাথায় রাখে না। এখানে লক্ষ্যণীয় যে গ্রামাঞ্চলে 'এনজিও' শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার থাকুক বা না থাকুক, বেশীর ভাগ এনজিওর নাম ইংরেজী আদ্যাক্ষর ভিত্তিক (যেমন BRAC) অথবা সমতুল্যভাবে গঠিত বাংলা শব্দ (যেমন প্রশিকা) হয়ে থাকে যেগুলো গ্রামীন মানুষদের ব্যবহৃত ভাষায় সহজে খাপ খায় না। কাজেই বলা বাহুল্য, 'এনজিও' শব্দটি বা বিভিন্ন এনজিওর নামের অর্থ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ও কর্মীদের কাছে যা, গ্রামীন মানুষদের কাছে নিশ্চয় তা থেকে ভিন্ন কিছু। আর তাই যখন আমরা শুনি যে গ্রামের লোকজন এনজিওদেরকে টাকাপয়সা, স্কুল, নলকূপ প্রভৃতি 'বিলানো'র সংগঠন হিসাবে দেখে (Ebdon ১৯৯৪:৫), তখন অবাক হওয়ার কিছু থাকে না। 'এনজিও' প্রত্যয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একজন লেখক মন্তব্য করেছেন যে, "the charitable dimension of aid is always perceived more rapidly than the more abstract notion of development which does not make any sense to the peasants" (Hours ১৯৯৪:৩৯).

যেহেতু প্রাচীনকাল থেকেই এ উপমহাদেশে দানের ঐতিহ্য চালু রয়েছে (Hours ১৯৯৪:৩৯), গ্রামীন বাংলাদেশীদের মধ্যে এনজিওদের দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখার প্রবণতাটা স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আধুনিক এনজিওদের পূর্বসুরীরা বেশীর ভাগ ছিল ধর্মীয় বা মিশনারী সংগঠন (এ প্রসঙ্গে দেখুন Abecassis 1990:81)। যদিও বাংলাদেশে কর্মরত বেশীর ভাগ এনজিওই (দেশী এবং বিদেশী) সম্ভবতঃ সেক্যুলার চরিত্রের, উন্নয়ন ক্ষেত্রে বেশ কিছু সুপরিচিত 'খ্রিস্টান' এনজিও-ও সক্রিয় রয়েছে (যেমন কারিতাস, CCDB)।

এছাড়া দেশে বর্তমানে বেশ কিছু 'ইসলামী' এনজিও-ও কর্মরত রয়েছে। তবে বাংলাদেশের এনজিওদের সম্পর্কে যখন কোন সাধারণ আলোচনা হয় (উন্নয়ন ডিসকোর্সের আওতায়), তখন প্রচ্ছন্নভাবে 'ইসলামী' এনজিওদের হিসাব-বহির্ভূতই রাখা হয়। এই যে 'ইসলামী এনজিও' বলে আলাদা একটা ক্যাটাগরি চালু রয়েছে, যেখানে অন্যান্য এনজিওগুলো সচরাচর 'খ্রিস্টান' বা 'সেক্যুলার' হিসাবে আলাদাভাবে শ্রেণীভুক্ত হয় না, তা থেকেই এই বহির্ভুততা ফুটে ওঠে। অর্থাৎ 'ইসলামী এনজিও'গুলো উন্নয়ন ডিসকোর্সে বা দৈনন্দিভাবে ব্যবহৃত 'এনজিও' নামক সাধারণ ক্যাটাগরির অংশ নয়। এখানে উল্লেখ্য যে সেক্যুলারবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে 'ইসলামী এনজিও'দের উপস্থিতি অন্যান্য এনজিওদের তুলনায় রাজনৈতিকভাবে অধিক বিতর্কিত রয়ে গেছে। বাংলাদেশে 'ইসলামীকরণ' প্রক্রিয়া শক্তি অর্জনের প্রেক্ষিতে খ্রিস্টান এনজিওরা একটা backlash-এর আশঙ্কা করতে শুরু করে, এবং যার বাস্তবতা পরে প্রমাণিত হয় (BRIDGE 1994:64)। তবে 'মৌলবাদী'দের আঘাতের মূল লক্ষ্য খ্রিস্টান বা বিদেশী এনজিওরা ছিল না। এর পরিবর্তে ব্র্যাক ও গ্রামীন ব্যাংকের মত দেশীয় 'সেক্যুলার' এনজিওগুলোই বেশী করে আক্রান্ত হয়েছিল।

এনজিও ও নারীদের উপর 'মৌলবাদী'দের আক্রমণ

বিগত কয়েক বৎসরে 'মৌলবাদী' হিসেবে অভিহিত গোষ্ঠীদের এনজিও-বিরোধী তৎপরতার অনেক খবর বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে। আক্রান্ত এনজিওদের পাশাপাশি তাদের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট নারীরাও ছিল আক্রমণের একটা বিশেষ লক্ষ্যবস্তু। পত্রপত্রিকার রিপোর্ট থেকে শুরু থেকেই এটা স্পষ্ট ছিল যে এসব আক্রমণ এনজিও কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে একটা সংঘবদ্ধ আন্দোলনের অংশ ছিল। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চে বগুড়াতে ২৬ জন যক্ষ্মা রোগী ও প্রায় ১০০ জন অন্তঃসত্তা নারীকে ব্র্যাকের কাছ থেকে চিকিৎসা নেওয়ায় বাধা দেওয়া হয়েছিল এবং একই সময় জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্র্যাকের ২৫টি স্কুল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ব্র্যাকের চিকিৎসা নিলে বা তাদের স্কুলে পড়াশুনা করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা খিস্টান হয়ে যাবে এরকম প্রচারণার ভিত্তিতে এই আক্রমণগুলো পরিচালিত হয়েছিল। এমনকি কোন নারী এনজিও সদস্য হলে তাকে তার স্বামী তালাক দিতে পারবে, এ ধরনের ফতোয়া কার্যকর হওয়ার ঘটনাও ঘটেছিল (বেগম ১৯৯৩:৫-৬)। তবে এসব ঘটনা শুধু বগুড়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যেমন প্রবল বিরোধিতার মুখে চট্ট গ্রামের পটিয়াতে ব্র্যাকের ৮০টি নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছিল। দেশের অন্যান্য জেলা থেকেও এরকম বহু ঘটনার বিবরণ পাওয়া গেছে। ব্র্যাকসহ অন্যান্য এনজিওর বিরোধিতাকারীদের 'মৌলবাদী' হিসেবে আখ্যায়িত করাটা যথার্থ হোক বা না হোক, উল্লিখিত ঘটনাগুলো যে একটা পরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার অংশ ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নুরুল আলম তাঁর এক গবেষণা-রিপোর্টে জানান যে এনজিও-বিরোধী আন্দোলন মূলতঃ পরিচালিত হয়েছে তিনটি ইসলামী রাজনৈতিক দলের আঁতাত

দিয়ে। এ দলগুলো হল বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ও নেজামি ইসলাম পার্টি (Alam ১৯৯৫:১০৬)। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার একটা অংশের (কওমী) ছাত্র ও শিক্ষকরাও এ আন্দোলনে জড়িত রয়েছে বলে তিনি দেখতে পান। মওলানা মান্নানের নেতৃত্বে মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন জামিয়াতুল মোদেরেসিন ব্র্যাকসহ অন্যান্য এনজিওর বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে ভীষণ সক্রিয় রয়েছে বলে আলম জানিয়েছেন। অপরপক্ষে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা অস্পষ্ট বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনায় জামায়াত সমর্থকরা জড়িত থাকলেও এ ব্যাপারে দলের জাতীয় নেতৃত্ব তেমন কিছু বলে নি বলে জানা গেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমার বর্তমান গবেষণা এলাকায় একজন জামায়াত কর্মী বলেছে যে জাতীয় নেতৃত্ব থেকে কোন নির্দেশ না থাকলেও ১৯৯৪ সালে যখন তাদের গ্রামে ব্র্যাক-বিরোধী আন্দোলন চলছিল, তখন স্থানীয় জনগণের (বিশেষতঃ স্থানীয় মাদ্রাসা, যেটি বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম কওমী মাদ্রাসা, এর ছাত্রশিক্ষকদের) আবেগ লক্ষ্য করে তারাও সভা ডেকেছিল এবং কেউ কেউ স্কুল ধ্বংস করার কাজে জড়িত ছিল।

জামায়াতে ইসলামী সরাসরি জড়িত থাকুক বা না থাকুক, যে সব দল এনজিও বিরোধী তৎপরতার পেছনে রয়েছে তারা যে 'ইসলাম'কে তাদের কর্মকান্ডের বৈধতার উৎস হিসাবে ব্যবহার করছে এটা সুস্পষ্ট। আর এ কারণেই এসব দলকে 'মৌলবাদী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু এরকম আখ্যা থেকে সংশ্লিষ্ট দলগুলোর উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্পর্কে আমরা তেমন কিছুই জানতে পারি না। যেসব 'ইসলামী' গোষ্ঠী এনজিও-বিরোধী তৎপরতা চালাচ্ছে, তাদের মতাদর্শ, উদ্দেশ্য ও আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত না জেনে কেন তারা এ আন্দোলনে নেমেছে সে সম্পর্কে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে পারি না। তবে তারা নিজেরা যেসব বক্তব্য ও বিবৃতি দিয়ে থাকে সেসব থেকে আমরা তাদের কর্মকান্ড ও উদ্দেশ্যের একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা পেতে পারি। এ বিষয়টিই আমি নীচে আলোচনা করছি।

পাশ্চাত্যকে প্রতিরোধ করা, শ্রেণী দ্বন্দ্ব, নাকি লিঙ্গীয় নির্যাতন?

এটা মোটামুটি একটা জানা বিষয় যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিচালিত তথাকথিত 'ইসলামী মৌলবাদী' আন্দোলনগুলো অনেক ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য-বিরোধী ভাবাবেগ ও মতাদর্শের সাথে জড়িত। ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস ও বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতাসমূহের প্রেক্ষাপটে (পশ্চিমা সাহায্য-প্রাপ্ত) এনজিওদের বিরুদ্ধে সংঘটিত আক্রমণকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ বা আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিরোধ হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বস্তুতঃ গ্রামের লোকজনদের মধ্য থেকেও এ ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। উদাহরণস্বরূপ, অনেকে তূঁত গাছের চাষকে (রেশম শিল্পের অংশ) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের নীল চাষের সাথে তুলনা করেছে (Alam ১৯৯৫:১১২)। এটাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ যে ব্র্যাকের মত এনজিওর উপর হামলা চালানোর ক্ষেত্রে আক্রমণের হোতারা এই অভিযোগ এনেছে যে এসব

সংস্থা খ্রিস্টান ধর্মের পক্ষে কাজ করছে বা লোকজনকে ধর্মান্তরিত করছে। এই (মিথ্যা) অভিযোগ তারা যা আসলেই যা বিশ্বাস করে তার প্রতিফলন নাকি একটা ধূর্ত চাল তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু একথা বলা যায় যে, গ্রামের বেশীরভাগ লোকজনের কাছে এনজিওরা হয়ত একধরনের 'বাইরের সত্তা' (alien presence), এবং এ সংক্রান্ত ব্যাপক কোন ধারণাকেই এনজিও-বিরোধী প্রচারণার ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

আলমের রিপোর্ট অনুসারে এনজিও কর্মকান্ডের বিরোধিতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ধর্ম-ভিত্তিক দলগুলো নিম্নলিখিত কারণগুলো উল্লেখ করেছে: ১) 'গৃহের সীমানার বাইরে' নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ; ২) এনজিওর নারী সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য দূরবর্তী স্থানে পাঠানো; ৩) এনজিও প্রকল্পগুলোতে পুরুষদের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত থাকা; ৪) ধর্মান্তরিত হওয়ার ভয়; ৫) বিদেশী ('খ্রিস্টান ও ইহুদী') সাহায্যের উপর অতি-নির্ভরশীলতা; ৬) চড়া সুদের হার; ৭) এনজিও-পরিচালিত স্কুলে ইসলামী/আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকা। 'ইসলামী' দলগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে উপরোক্ত অভিযোগগুলোকে গ্রামীন বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া উন্নয়নের 'পশ্চিমা' মডেলের একটি 'ইসলামী' জবাব হিসেবে দেখা সম্ভব। যেমন, প্রথম তিনটি অভিযোগকে দেখা যেতে পারে 'ইসলামী' দৃষ্টিকোণ থেকে নারী ও পুরুষের নিজ নিজ গন্ডী কি হওয়া উচিত তার একটা ধারণার প্রতিফলন হিসেবে। ৪ ও ৫ নম্বর অভিযোগ এনজিওদের পাশ্চাত্যের সাথে এক করে দেখার সাধারণ প্রবণতার সাথে মেলে। ৬ নং এর ক্ষেত্রে বলা যায় যে সুদের হার বেশী কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর, যেখানে ইসলামে সুদকেই হারাম করা হয়েছে। (এ প্রসঙ্গে Hours [1995:66] জানান যে তাঁর ঘুরে আসা একটা গ্রামে ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ বিধায় গ্রামীন ব্যাংক গ্রামের 'মৌলবাদী'দের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল)। শেষোক্ত অর্থাৎ ৭ নং অভিযোগটির কারণ মোটামুটি স্পষ্ট। একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর লোক ইসলাম বলতে যা বুঝে থাকতে পারে, সে অর্থে হয়ত এই অভিযোগগুলোকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নের একটা মূল্যায়ন হিসেবে দেখা যায়।

এনজিও-বিরোধী তৎপরতাকে 'পাশ্চাত্যে'র আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে বিবেচনা করা গেলেও অসমতার আরও কাছের প্রেক্ষাপট--বিশেষ করে শ্রেণী ও লিঙ্গ--কে হিসেবে নিলে কিছুটা ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন, ব্র্যাক বা গ্রামীন ব্যাংকের মত এনজিওকে 'পশ্চিমা' স্বার্থ ও মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে দেখা গেলেও, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটে এদেরকে দেশের এলিট-শ্রেণীভুক্ত একটা বিশেষ গোষ্ঠীর মূল্যবোধ ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে দেখা যায়। গ্রামীন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ইউনুস বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন মন্ত্রী ছিলেন। একইভাবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত এনজিওসমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকদের নিজ নিজ রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন, দেশের প্রেক্ষাপটে তাঁরা সবাই তুলনামূলকভাবে ধনী ও ক্ষমতাবান, অন্ততঃ যে সব দরিদ্র লোকদের জন্য তাঁরা কাজ করেন তাদের তুলনায়তো বটেই।

দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে যে সব অসমতা বিরাজ করছে সেগুলোর প্রেক্ষাপটে এনজিও-বিরোধী প্রচারণার যে ভিন্ন অর্থ হয় তা বিভিন্নভাবে বোঝা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, এনজিও-পরিচালিত স্কুলগুলোতে ইসলামী ও আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমরা স্মরণ করতে পারি যে মাদ্রাসা ব্যবস্থার ছাত্র ও শিক্ষকরা এনজিও-বিরোধী তৎপরতায় বেশ সক্রিয় বলে জানা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে মাদ্রাসা ব্যবস্থা ও দেশের মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যকার অসাম্য সমাজে বরাবরই অসন্তোষ ও টানাপোড়েনের উৎস হিসেবে কাজ করেছে। যারা মাদ্রাসায় পড়তে যায় তারা মূলতঃ দরিদ্র লোকদের সন্তান, এবং পড়াশুনা শেষে তারা মূলতঃ বিভিন্ন স্বল্প-আয়ের চাকরিতেই নিয়োগ পায় (যেমন মাদ্রাসার শিক্ষক, গ্রামের ইমাম প্রভৃতি পদে)। যেসব জায়গায় মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকরা নিজেদের কম আর্থিক সাহায্য পাচ্ছে বলে মনে করে, সেসব জায়গায় এনজিও-প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে অনুদানের অর্থ যাচ্ছে দেখলে তাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ জাগাটা স্বাভাবিক। একইভাবে, যেখানে ব্যাপক দারিদ্র্যের কষাঘাতে নারী পুরুষ উভয়ই জর্জরিত, সেখানে গ্রামীন ব্যাংক ও ব্র্যাকের মত এনজিওরা কেন শুধুমাত্র নারীদেরকেই ঋণ দিচ্ছে তা হয়ত গ্রামের মানুষদের বেশীর ভাগই বুঝতে অক্ষম। অনেক এনজিও (বিশেষ করে গ্রামীন ব্যাংক) নিজেরাই যেখানে মূলতঃ পুরুষদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে, সেখানে গ্রামের মানুষদের এটা বলার কোন মানে হয় না যে 'তাদের মেয়েদের' ক্ষমতায়িত করা দরকার।

আমরা যদি গ্রামের পরিসরে নজর দেই, তাহলে দেখতে পাই যে এনজিওদের বিরুদ্ধে তথাকথিত 'মৌলবাদী'দের অভিযোগগুলো যত না আধিপত্য ও শোষণের বহিস্থ উৎসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার, তার চাইতে এগুলো গ্রাম-পর্যায়ের বৈষম্য টিকিয়ে রাখার অজুহাত। যেমন জানা যায় যে গ্রামীন ব্যাংকের সাপ্তাহিক সভাগুলোতে নারীদের উপস্থিতির সমালোচনা শুধুমাত্র বয়স্ক 'ধার্মিক' ব্যক্তিরাই করে না, বরং যেসব ধনী কৃষক শ্রমের শস্তা উৎস হারাচ্ছে তারাও এ ব্যাপারে সোচ্চার (Hours ১৯৯৫:৬৬)। (পটিয়ায় মাঠ গবেষণার সময় আমি এ ধরনের কথা শুনেছি যে 'গ্রামীন ব্যাংক ও গার্মেন্টস আসাতে কাজের মহিলা পাওয়া যায় না'।) একইভাবে এ সম্ভাবনাও রয়ে যায় যে, যখন সুদের বিরুদ্ধে ইসলামী নিষেধাজ্ঞার কথা তুলে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এনজিওদের সমালোচনা করে, তখন হয়ত তারা গ্রামীন মহাজনদের স্বার্থকেই রক্ষা করে চলছে, যাদের জন্য গ্রামীন ব্যাংকের মত প্রতিষ্ঠান স্পষ্টতঃই প্রতিযোগী হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

আরও ক্ষুদ্র পরিসরে নজর দিতে গেলে আমরা গার্হস্থ্য পর্যায়ে পৌঁছি, যেখানে অসমতার একটা সার্বজনীন রূপ অর্থাৎ লিঙ্গীয় বৈষম্যের ভিত্তি প্রোথিত রয়েছে। সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন পর্যায়ে লিঙ্গীয় অসমতার বহিঃপ্রকাশ থাকলেও পরিবারের গন্ডীতেই এটির সবচাইতে মূর্ত রূপ দেখা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পুরুষ সবাই একটা অভিন্ন 'পিতৃতান্ত্রিক' মতাদর্শকে ধারণ করে চলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান লিঙ্গীয় সম্পর্কের কাঠামোতে কোন পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা (বাইরের লোকদের দ্বারা) নেওয়া হচ্ছে এটা মনে হলে তারা সবাই

একজোট হয়ে এটির বিরোধিতা করবে, এটাই প্রত্যাশিত। কাজেই এটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে এনজিও-বিরোধী আন্দোলনকারীদের বক্তব্যে তাদের বিরোধিতার কারণ হিসেবে এনজিও কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণকেই সবচাইতে বড় করে দেখানো হয়েছে (Alam ১৯৯৫)।

এনজিও-বিরোধী কার্যকলাপের অংশ হিসেবে নারীদের উপর আক্রমণের যেসব ঘটনা ঘটেছে এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই ফতোয়া জারির মাধ্যমে ঘটেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এনজিও কর্মকান্ডে অংশ নিয়ে নারীরা সামাজিক আচরণবিধি লংঘন করছে কিনা সে প্রশ্নের নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম্য সালিশ বসানো হয়েছে। আমার গবেষণা এলাকা পটিয়ায় আমি জানতে পেরেছি যে, বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে নাকি হামেশাই এ ধরনের প্রচারণা চালানো হয় যে, গ্রামীন ব্যাংকে মেয়েদেরকে এসব স্লোগান শেখানো হয়: 'স্বামীর কথা শুনবো না, গ্রামীন ব্যাংক ছাড়বো না।' বা, 'স্যার বড় না স্বামী বড়? স্যার বড়, স্যার বড়।' নারীদের কর্মকান্ড ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে গ্রামীন মাতব্বররা মওলানাদের 'অত্যুৎসাহী সমর্থন' তো পায়ই (দ্রঃ অধশতশ ১৯৮৯:৪-৫), তার উপর অনেক সময় সংশ্লিষ্ট নারীদের স্বামী, ভাই বা পিতারাও এক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করতে পারে। এই অর্থে এনজিওদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যতটা না শহুরে এলিট বা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কৌশল, তার চাইতে বেশী গ্রামীন পুরুষদের 'নিজেদের মেয়েছেলেদের' উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রচেষ্টা, যে নিয়ন্ত্রণ 'বাইরের' লোকদের (যাদের অধিকাংশই পুরুষ) হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তারা দেখতে পায়।

প্রতিরোধে ও আপোষে বাংলাদেশের নারী

বৃহত্তর প্রেক্ষাপট: 'রাজনীতির অঙ্গনে' বাংলাদেশের নারী

বাংলাদেশে নারীদের কিভাবে 'পশ্চিমা সাহায্য-প্রাপ্ত' এনজিও ও তাদের 'মৌলবাদী' প্রতিপক্ষের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা হয়েছে তা আলোচনা করতে গিয়ে এই নিবন্ধে এখন পর্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কোন নজর দেওয়া হয় নি। বিষয়টি বাংলাদেশের নারীদের নিজেদের ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আলোচ্য ঘটনা প্রবাহের প্রেক্ষিতে নারীরা সবাই তাদের নিপীড়িত অবস্থাকে নীরবে মেনে নেয় নি। বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেক নারী সংগঠন বিভিন্ন গণ আন্দোলনের পুরোভাগে থেকেছে। উদাহরণস্বরূপ, এরশাদ সরকার যখন ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করার মাধ্যমে এর 'ইসলামীকরণ' নীতিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়েছিল, তখন ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার এই মরিয়া প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যারা সর্বপ্রথম সোচ্চার হয়েছিল নারী সংগঠনগুলো ছিল তাদের অন্যতম (দ্রঃ Kabeer ১৯৯১:১৩৬-১৩৯)। এক্ষেত্রে অবশ্য আমরা শহুরে শিক্ষিত নারীদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সংগঠনের কথাই বলছি, যেগুলো হয়ত সবক্ষেত্রে সবশ্রেণীর নারীর প্রতিনিধিত্ব করে না। কাজেই তাদের বিরোধীরা তাদেরকে সমাজের 'পশ্চিমায়িত' প্রান্তিক অংশের

প্রতিনিধি হিসেবে তুচ্ছ করে দেখার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে নারী কর্মী ও সংগঠকদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের আন্দোলনের শেকড় এদেশের ইতিহাস ও সমাজদেহেই প্রোথিত রয়েছি।

বাংলাদেশের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনে নারীরা উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে। ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলনে প্রীতিলতা, তেভাগা আন্দোলনে ইলা মিত্র, বাঙালী মুসলমান নারীদের জাগরণে রোকেয়া, মুক্তিযুদ্ধে তারামন বিবি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপক্ষের শক্তিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত গণআন্দোলনে জাহানারা ইমাম, প্রমুখ ব্যক্তির কথা এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার মত নেত্রীর উপস্থিতিও তাৎপর্যপূর্ণ। এটা প্রায়ই উল্লেখ করা হয় যে এ উপমহাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বের শীর্ষে নারীদের আবির্ভাব মূলতঃ পারিবারিক যোগসূত্রেই ঘটেছে, ফলে তা সমাজে নারীর অবস্থানের যথার্থ প্রতিচ্ছবি নয়। কথাটা কিছুটা ঠিক বটে, তবে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে একইরকম ধারায় পুরুষরাও ক্ষমতায় এসেছে। কাজেই এককভাবে পারিবারিক যোগসূত্রের বিষয়টি শীর্ষ রাজনৈতিক পদে নারীর উপস্থিতির তাৎপর্যকে খাটো করে না। বিভিন্ন লেখালেখিতে, বিশেষ করে পাশ্চাত্যে, এ উপমহাদেশে নারীর সামাজিক অবস্থানকে যতটা নীচু করে দেখানো হয়, বাস্তবে যদি তাই হত তাহলে এ অঞ্চলের এতগুলো দেশে সরকার-প্রধান পদে নারীরা আদৌ অধিষ্ঠিত হত কিনা সন্দেহ। যাহোক, এখানে আর একটা বিষয় উল্লেখ করা যায়, সেটা হল, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে মূলতঃ বাম ও মধ্য ধারাতেই নারীদের উপস্থিতি বেশী লক্ষ্যণীয় হলেও, ডান শিবিরেও নারী কর্মী রয়েছে। যদিও 'ইসলামী' দলগুলো জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণের বিরোধিতা করে, তবুও জামায়াতে ইসলামীর মত দলেরও যে 'মহিলা শাখা' রয়েছে, তা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তারাও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে কিছুটা হলেও মেনে নিয়েছে।

নারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই অবশ্য সংগঠিত রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত নয়। তাদের অনেকের জন্য 'রাজনীতি' থেকে দূরে থাকাটা হয়তবা একধরনের নির্লিপ্ততার প্রতিফলন। অন্যদের জন্য এটা হতে পারে পারিপার্শ্বিকতার বাধার মুখে একধরনের আপোষ। তবে সবচেয়ে ক্ষমতাহীন নারীও পরিস্থিতির তাগিদে রুখে দাঁড়াতে পারে। অন্যদিকে সবচেয়ে ক্ষমতাবান নারীকেও লিঙ্গীয় ভূমিকা ও নিয়মকানুনের প্রচলিত ধারার সাথে কিছুটা হলেও আপোষ করে চলতে হয়। এই অর্থে যে কোন নারীই নিজ পরিপার্শ্বের সাথে প্রতিরোধ ও আপোষের সমন্বয়েই 'পুরুষ-শাসিত' সমাজে তার ভূমিকা ও পরিসর ঠিক করে নেয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রতিরোধ ও আপোষের এই যুগপৎ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। শেখ হাসিনা হয়ত নারীবাদী নন, কিন্তু তিনি নিশ্চয় ধর্মীয় মৌলবাদের সমর্থকও নন। বরং যে রাজনৈতিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব তিনি করেন, সে অনুযায়ী ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁর সুদৃঢ় অবস্থান নেওয়ার কথা। তথাপি তাঁর দল যেমন জামায়াতে ইসলামীর মত দলের সাথে

সমঝোতা করেছে, তেমনি তাঁর পরণেও 'ইসলামী' চিহ্ন সংযোজিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ধর্মীয় তাগিদ কতটা কাজ করেছে বলা মুশকিল। তবে এটাই মনে হয় যে একজন নারী রাজনীতিবিদ হিসেবে ক্ষমতায় আসতে গিয়ে 'ইসলামী' বেশ ধারণ করার চাপটা একজন পুরুষের তুলনায় তাঁর উপর আরও বেশী কাজ করেছে। বাংলাদেশের সাধারণ নারীরাও দৈনন্দিন জীবনে এ ধরনের বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে থাকে। নারীরা কিভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে তা বুঝতে হলে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তারা কখন বিদ্যমান ব্যবস্থাকে মেনে নেয়, আর কখন তা প্রতিহত করার উদ্যোগ নেয়, এসব বিষয়ের বিস্তারিত ও ঘনিষ্ঠ বিশ্লেষণ আবশ্যক।

গ্রামীন নারীদের প্রতিরোধের ধরন

উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গ্রামীন নারীদের নিয়ে যে ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও টানাহেঁচড়া হয়েছে, তাতে করে এটা ভাবা যায় না যে তারা অন্যদের ক্ষমতার খেলায় শুধু ক্রীড়নক রয়ে গেছে। তবে বাংলাদেশের (তথা তৃতীয় বিশ্বের) নারীদের নিয়ে যেসব লেখালেখি হয়েছে, সেসবে তাদেরকে নিজ উদ্যোগে কাজ করতে সক্ষম চিন্তাশীল সত্তা হিসেবে খুব কমই দেখানো হয়েছে এ পর্যন্ত। কাজেই বিভিন্ন ধরনের চাপের মুখে তারা কি ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে, সে বিষয়টি গভীর ও বিস্তারিতভাবে তলিয়ে দেখা কঠিন। তবে এ বিষয়ে যেটুকু কাজ হয়েছে, এবং আমি নিজে আমার বর্তমান গবেষণায় যা জানতে পারছি, এসবের ভিত্তিতে বাংলাদেশের গ্রামীন নারীদের প্রতিরোধের ধরনের একটা খসড়া চিত্র দাঁড় করানো সম্ভব।

স্ত্রী-প্রহারকারী স্বামী থেকে শুরু করে পুলিশের মত পুরুষ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের গ্রামীন নারীরা কিভাবে সংগঠিত হয়েছে, তার কিছু বিবরণ আমরা McCarthy (১৯৯৩)-তে পাই। তিনি যে তিনটি 'কেস স্টাডি' নিয়ে আলোচনা করেছেন সেগুলোর সবটিতেই সংশ্লিষ্ট নারীরা কোন না কোন নারীদের এনজিওর সাথে (নিজেরা করি, সপ্তগ্রাম, প্রশিকা) জড়িত ছিল। একটি ক্ষেত্রে নারীরা একজোট হয় একজন পুরুষকে পিটিয়েছিল, যে লোকটি তার স্ত্রীকে মারধর করে চলছিল তাকে সাবধান করে দেওয়ার পরও। অন্য আরেকটি ক্ষেত্রে একজন মাতব্বর যখন তাকে অমান্য করছিল এরকম একদল স্থানীয় নারীকে শায়েস্তা করার জন্য গ্রামে পুলিশ ডেকে আনে, তখন সংশ্লিষ্ট নারীরা দল বেঁধে পুলিশদের উপর চড়াও হয়, এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও ইউনিফর্ম কেড়ে নিয়ে তাদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয় (পূর্বোক্ত:৩৪২)। এসব ঘটনা ও পরবর্তী উদ্ভূত পরিস্থিতির উপর আলোচনা করতে গিয়ে খদইতক্ষঢ়বঁ মন্তব্য করেছেন যে প্রকাশ্যে সংগঠিত ও হার মানতে নারাজ নারীদের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা পুরুষদের খুব কমই রয়েছে, ফলে এ ধরনের পরিস্থিতিতে কি করতে হবে তা তারা সহজে ঠিক করে উঠতে পারে না শুরুতে (পূর্বোক্ত:৩৪৮)। উল্লিখিত ঘটনাগুলো বিরল প্রকৃতির ও কিছুটা অভিনব সন্দেহ নেই (অবশ্য মাঝেমধ্যে পত্রপত্রিকায়ও এ ধরনের খবর

আসে)। এসব ক্ষেত্রে এনজিওদের সংশ্লিষ্টতা একটা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকতে পারে। তবে এনজিওদের ভূমিকা বা সহায়তা ছাড়া গ্রামীন নারীরা কখনও কোথাও সংঘবদ্ধ হয়ে পুরুষ কর্তৃত্বের মুখোমুখি হয় নি, একথা ভাবার কোন কারণ নেই। এনজিওদের সংশ্লিষ্টতা মূলতঃ যে পরিবর্তন এনেছে বলে মনে হয় তা হল এই যে গ্রামীন নারীদের স্থানীয় সংগ্রামগুলোকে তারা বৃহত্তর পর্যায়ে নজরে এনেছে।

আমার গবেষণাতে দেখেছি যে পুরুষরা নিজেরাই স্বীকার করে যে তারা নারীদের সংগঠিত 'আক্রমণ'কে ভয় পায়। গ্রামীন ব্যাংকের ঋণ ব্যবহার ও শোধ করার প্রেক্ষিতে এই প্রসঙ্গ উঠেছে। আগেই যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, নারীদের প্রাপ্ত ঋণের অর্থ মূলতঃ তাদের পুরুষ আত্মীয়রাই ব্যবহার করে। দেখা গেছে যে, পুরুষরা যখন সরাসরি নিজেরা ঋণ নেয়, তখন প্রায়ই তারা ঠিক সময়ে বা আদৌ ঋণ শোধ করে না। অন্যদিকে নারীদের মাধ্যমে ঋণ নিলে তা শোধ করার ব্যাপারে তারা অধিকতর সচেষ্ট থাকে। কেন এই পার্থক্য, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পুরুষরা বলেছে যে নারীদের মাধ্যমে পাওয়া ঋণের কিস্তি ঠিক সময়ে শোধ না করলে নারীরা সংগঠিত হয়ে তাদের আক্রমণ করবে (এখানে 'আক্রমণ' মূলতঃ মৌখিকই--একজন পুরুষকে অক্ষম হিসেবে চিহ্নিত করা, তাকে তিরস্কার করা)। কাজেই নারীদের সামনে অপদস্থ ও হেয় হওয়ার ভয়ে পুরুষরা ঋণ শোধ করার ব্যাপারে অধিকতর তৎপরতা দেখায়।

সংগঠিত প্রচেষ্টা ছাড়াও নারীদের প্রতিরোধের প্রাত্যহিক রূপের (নৎনক্ষধর্তঁ পষক্ষলড় ষপ ক্ষনড়ভড়ঢ়তশদন) প্রতিও নজর দেওয়া প্রয়োজন (দ্রঃ Moore ১৯৮৮: ১৭৮-১৮৩; Scott ১৯৮৫)। এক্ষেত্রে সংস্কৃতির লিঙ্গভিত্তিক তারতম্যের বিষয়টি প্রাসঙ্গিক। 'পুরুষশাসিত' সমাজে নারীদের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেসব নিয়মকানুন বা মতাদর্শ চালু রয়েছে, নারীরা যে সবসময় সেসব অনুসরণ করে চলে এমন নয়। উদাহারণস্বরূপ, Gardner (n.d.) সিলেটের একটি গ্রামে লক্ষ্য করেছেন যে, সেখানে 'ইসলামী অনুশাসন' কড়াকড়িভাবে আরোপ করার প্রচেষ্টা চালু থাকলেও অনেক নারীই এমন সব 'বিকল্প ডিসকোর্সে' অংশ নেয়--যেমন গান এবং নির্দিষ্ট কিছু আচার অনুষ্ঠান--যেগুলো সূক্ষ্মভাবে 'যথাযথ' নারী আচরণ ও শালীনতার কর্তৃত্বশীল ধ্যানধারণাকে অমান্য করে। (Blanchet 1984-ও অনুরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন)। যেসব পরিস্থিতিতে পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারে না, সেসব ক্ষেত্রে তাদের 'অবজ্ঞার ভান' বা খানিক দূরে সরে থাকাটা নারী ও পুরুষের 'ক্ষমতা'র স্বতন্ত্র বলয়কেই নির্দেশ করে। অর্থাৎ নারীদের একেবারে ক্ষমতাহীন ভাবার কোন কারণ নেই, বরং নির্দিষ্ট কিছু সাংস্কৃতিক বলয়ে তারা 'পুরুষতন্ত্র' আরোপিত কর্তৃত্বশীল ধ্যানধারণার বিপরীতে নিজেদের অবস্থান প্রকাশ করতে পারে।

দৈনন্দিন জীবনে নারীদের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ প্রকাশের বিদ্যমান সাংস্কৃতিক রূপগুলো কি, সেগুলো নির্ণয় করতে হলে বেশ কিছু জানা বিষয়ের প্রতি নূতন করে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। যেমন, নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে 'spirit possession'-কে প্রতিরোধের একটি ধরন হিসেবে দেখা হয়েছে (দ্রঃ Ong

১৯৮৭)। গ্রামীন বাংলাদেশে নারীদের উপর জ্বিন-ভূত ভর করার ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। Blanchet (১৯৮৪:৫২) জানান যে পুরুষদের চাইতেও নারীদের উপরই জ্বিন-ভূত বেশী ভর করে, এবং বিশেষ ধরনের নারীদের মধ্যেই এই প্রবণতা বেশী দেখা যায়--যেমন যেসব নারী সহজে খাপ খাওয়াতে পারছে না, বা নূতন কোন ভূমিকায় অভ্যস্ত হচ্ছে, বা যারা আত্মবিশ্বাসহীন ও দুর্বল প্রকৃতির ('insecure and fragile')। নিজের চোখে দেখা ভূতের আছর হওয়ার একটা ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আরতশদবনঢ় মন্তব্য করেছেন, 'এটা অদ্ভুত ব্যাপার যে আনোয়ারা, যে সচরাচর ভিরু এবং চুপচাপ প্রকৃতির, এখন উঁচু গলায় যা খুশী বলছে। ... স্বাভাবিক আচরণের সব নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আনোয়ারা শ্বাশুড়ী ও বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষদের সামনে একটা দৃশ্য তৈরী করেছে' (পূর্বোক্ত)।

উপরের উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে 'দুর্বল'-এরও প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ প্রকাশের নিজস্ব ভাষা বা পন্থা রয়েছে। আমার মাঠকর্মেও আমি লক্ষ্য করেছি যে নারীদের সবাই পুরুষ কর্তৃত্বকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয় না। উদাহরণস্বরূপ, আমার এক তথ্যদাতা, হাসিনা নামের একজন গ্রামীন ব্যাংকের সদস্যাকে (যার স্বামী আর একটা বিয়ে করে অন্য একটা গ্রামে থাকে) একজন মৌলভী যখন বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় বিধিনিষেধের দোহাই দিয়ে (যেমন, সুদ হারাম, মেয়েদের 'পদা'র বাইরে যাওয়া উচিত নয়) গ্রামীন ব্যাংক ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলেছিল, তখন সে সরাসরিভাবেই পাল্টা জবাব দিয়েছিল, 'ঠিক আছে, আপনি আমাকে টাকা দেন, খাওয়ান। আমি গ্রামীন ব্যাংক ছেড়ে দেব।' তার এই যুক্তির উত্তরে উক্ত মৌলভী বলতে বাধ্য হয়েছিল, 'তোমার সাথে আমি তর্ক করে পারব না।' একইভাবে দেখা গেছে, বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের সংশ্লিষ্টতার বিরুদ্ধে দেওয়া মৌলভীদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নারীদের মধ্যে মৌলভীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঠাট্টা ও গল্প চালু রয়েছে যেগুলোতে শেষোক্তদের বক্তব্য ও কাজের মধ্যকার পার্থক্য/বৈপরীত্য ফুটে ওঠে।

অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে 'যথাযথ' নারী আচরণের প্রচলিত ধারা এবং 'ধর্মীয়' বিধিবিধানকে ব্যবহার করেও নারী তার গতিশীলতা এবং পরিসর নির্ধারণ করছে, বিভিন্ন সীমানা ভাঙছে। যেমন, উন্নয়ন সংস্থার সাথে জড়িত হওয়ায় নারীরা বেপর্দা হচ্ছে, এরকম কথা কেউ বললে তাদের অনেকে বলে, 'আমরা বোরখা পরেই বের হই এবং (উন্নয়ন সংস্থার) পুরুষরা আমাদের 'মা-বোন'-এর মর্যাদা দেয়, তাহলে কেন বেপর্দা হব? ... আমরা প্রয়োজনে যাই। ... পর্দা হচ্ছে মনের।' ইত্যাদি। আবার কেউ কেউ এরকম কথাও বলেছে, 'আমরা স্বামী, বাবা, ছেলে বা ভাইয়ের অনুমতি নিয়ে ঋণ নিচ্ছি। আমাদের পর্দার মধ্যে রাখার দায়িত্ব পরিবারের পুরুষদের। সুতরাং যখনই তারা বাইরে যাবার অনুমতি দিয়ে দেয় তখন থেকে মেয়েদের আর কোন গুনাহ্ নেই। গুনাহ্ হলে পুরুষদেরই হবে।' মূলতঃ এ ধরনের যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নারীরা পুরুষদের উপর দায়ভার চাপিয়ে সমাজের কর্তৃত্বশীল নিয়মকানুনকে প্রতিরোধ করে এবং তাদের গতিশীলতা ও পরিসর নির্ধারণ করে।

উপরের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে কিছুটা ধারণা করা যায় বাংলাদেশের গ্রামীন নারীদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল যারা, তারাও পুরুষ কর্তৃত্বের মোকাবেলা করার, মুখোমুখি হওয়ার, কোন না কোন পথ বের করে নিতে পারে। নারীদের প্রতিরোধের একটা বিশদ চিত্র পেতে হলে তাদের প্রত্যক্ষ ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি নজর দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিরোধের অন্যান্য ধরনগুলোকেও তুলে ধরতে হবে।

উপসংহার

> বিবেক আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবনতি দেখাইয়া দিতেছে--এখন উন্নতির চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।...আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না। - রোকেয়া, ১৩১১ বাংলা (১৯৭৩:২৭-২৮)

লিঙ্গীয় মতাদর্শ, উন্নয়ন নীতিমালা ও চর্চা, এবং ধর্মীয় মৌলবাদের রাজনীতি একে অপরের সাথে কিভাবে মিথষ্ক্রিয়া করে তা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা কয়েকটা বিষয় লক্ষ্য করেছি। প্রথমতঃ, 'উন্নয়ন' এবং 'ধর্মীয় মৌলবাদ' এই উভয় প্রত্যয়ই অনেক ধরনের প্রপঞ্চ ও প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে বিধায় তাদের সম্পর্ক নিয়ে কোন সাধারণীকরণ করা সম্ভব নয়, তবে সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে এদের মধ্যকার সম্পর্ক পরীক্ষা করে দেখা উপযোগী। দ্বিতীয়তঃ, এই সম্পর্ক পরীক্ষা করার বেলায় লিঙ্গকে আলোচনা ও বিশ্লেষণের কেন্দ্রে নিয়ে আসা উপযোগী, এবং কোন কোন প্রেক্ষিতে তা অপরিহার্য। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন সমকালীন লড়াইয়ে নারীরা কিভাবে কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হয়ে উঠেছে এ বিষয়টি বুঝতে হলে এসব লড়াইয়ের একাধিক স্তরের প্রতি নজর দিতে হবে। চতুর্থতঃ, বিভিন্ন স্বার্থের দ্বন্দ্বে নারীদের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হলেও তারা নিজেরা নিষ্ক্রিয় সত্তা নয়, বরং তারাও নিজেদের সিদ্ধান্তে নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে।

বাংলাদেশে এনজিও ও নারীদের উপর পরিচালিত আক্রমণের প্রেক্ষাপটে এই যুক্তি দেখানো হয়েছে যে এ বিষয়টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। পর্যায়ক্রমে বৈশ্বিক, জাতীয়, স্থানীয় ও গার্হস্থ্য পরিসরে বিরাজমান অসমতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। এনজিওদের উপর আক্রমণকে 'পশ্চিমা' শক্তি বা 'শহুরে মধ্যবিত্ত' সমাজের আধিপত্য/শোষণের বিরুদ্ধে 'প্রতিরোধ' হিসেবে দেখা গেলেও সমস্যার লিঙ্গীয় দিকটির প্রতিই সর্বদা নজর রাখতে হবে। একজন আক্রান্ত নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে এনজিও-বিরোধীদের কর্মকান্ডকে 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিরোধ' হিসেবে মহিমান্বিত করে দেখাটা নিশ্চয় দুর্ভাগ্যজনক হবে। অন্যদিকে গ্রামীন নারীরা নিজেরা কিভাবে কতটা প্রতিরোধ করছে--একদিকে 'মৌলবাদী'দের বিরুদ্ধে, এবং অন্যদিকে হয়তবা 'পশ্চিমা' ও 'শহুরে মধ্যবিত্ত' স্বার্থের বিরুদ্ধে--সে বিষয়ের উপরও নজর দিতে হবে। বাংলাদেশের 'দরিদ্র গ্রামীন নারী'দের শুধুমাত্র পরিস্থিতির অসহায় শিকার হিসেবে উপস্থাপনা করার পরিবর্তে তাদের সক্রিয় ও সৃজনশীল ভূমিকার উপরর জোর দিতে হবে।

তথ্যসূত্র

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৯৭৩) 'স্ত্রী জাতির অবনতি', মতিচুর, রোকেয়া রচনাবলী, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

সুরাইয়া বেগম (১৯৯৪) 'বাংলাদেশে মৌলবাদ এবং নারী ঃ একটি পর্যালোচনা' সমাজ নিরীক্ষণ, ৫৪: ১- ১৯।

Abecassis, David (1990) Identity, Islam and Human Development in Rural Bangladesh. Dhaka: University Press Limited.

Abdullah, T. (1974) Village Women As I Saw Them. Dhaka: Ford Foundation.

Adnan, S. (1989) Birds in a Cage: Institutional Change and Women's Position in Bangladesh. [Photocopy.] Revised version [for publication] of paper presented at the conference on Women's Position and Demographic Change in the Course of Development, organized by the International Union for the Scientific Study of Population, Oslo, June 1988.

Afshar, H., ed. (1991) Women, Development and Survival in the Third World. London: Longman.

------ed. (1993) Women in the Middle East: Perceptions, Realities and Struggles for Liberation. Basingstoke: Macmillan.

Ahmed, Akbar S. and Donnan, Hastings eds. (1994) Islam, Globalization and postmodernity. London: Routledge.

Alam, S. M. Nurul (1995) NGOs Under Attack: A Study of Socio-Cultural and Political Dynamics of NGOs Operations in Bangladesh. (Unpublished Paper).

Baykan, A. (1990) Women Between Fundamentalism and Modernity. In Theories of Modernity and Postmodernity, ed. B. S. Turner. London: Sage.

Blanchet, Thérèse (1984) Meanings and Rituals in Birth in Rural Bangladesh. Dhaka: University Press Limited.

Caplan, Lionel, ed. (1987) Studies in Religious Fundamentalism. Houndmills:Macmillan Press.

Carroll, Theodora Foster(1983) Women, Religion, and development in the Third World. New York: Praeger Publishers.

Ebdon, Rosamund (1994) NGO Expansion and the Fight to Reach the Poor: Gender Implications of a Growing Trend of Encroachment in Bangladesh. Paper presented at a workshop titled Getting Institutions Right for Women in Development, IDS, University of Sussex, November 3-4.

Escobar, Arturo (1991) Anthropology and the Development Encounter: The Making and the Marketing of Development Anthropology. American Ethnologist, 18(4):658-682.

------(1995) Encountering Development: The Making and Unmaking of

the Third World. Princeton: Princeton University Press.
Ferguson, James (1994) The Anti-Politics Machine: "Development," Depolitization, and Bureaucratic Power in Lesotho [orig. 1990]. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Gardner, Katy (n.d.) Women and Islamic Revivalism in a Bangladeshi Migrant Community.
Goetz, Anne Marie and Sen Gupta, Rina (1996) Who Takes the Cradit? Gender, Power, and Control over Loan Use in Rural Credit Programs in Bangladesh. In World Development, 24(1):45-63.
Hashemi, S. M., Schuler, S. R. and Riley, A. P. (1996) Rural Cradit Programs and Women's Empowerment in Bangladesh. In World Development, 24(4):635-654.
Henkel, H and R. I. Stirrrat (1996) Fundamentalism and Development: A Preliminary Survey. [Work in progress: Draft.] University of Sussex.
Hobart, Mark (1993) Introduction: The Growth of Ignorance? In An Anthropological Critique of Development: The Growth of Ignorance, ed. M. Hobart, pp.1-30. London: Routledge.
Hours, Bernard (1995) Islam and Development in Bangladesh. Dhaka: Centre for Social Studies. [Tr. S. M. Imamul Huq]
Jahan, Rounaq (1989) Women and Development in Bangladesh: Challenges and Opportunities. Dhaka: The Ford Foundation.
Kabeer, Naila (1991a) The Quest for National Identity: Women, Islam and the State of Bangladesh. In, D. Kandiyoti, ed. Women, Islam and the State. London: Macmillan. pp. 115-143
------(1991b) Cultural Dopes or Rational Fools? Women and Labour Supply in the Bangladesh Garment Industry. In The European Journal of Development Research, 3(1):133-160
------(1994) Reversed Realitie: Gender Hierarchies and Development.
------(1995) Targeting Women or Transforming Institutions? Policy Lessons from NGO Anti-Poverty Efforts. Development in Practice, 5(2):108-116.
Kandiyoti, D., ed. (1991) Women, Islam and the State. London: Macmillan.
King, Ursula, ed. (1995) Religion and Gender. Oxford: Blackwell.
Lindenbaum, S. (1974) The Social and Economic Status of Women in Bangladesh. Dhaka: Ford Foundation.
Marchand, Marianne H. and Parpart, Jane L (1995) Feminism/Postmodernism/ Development. London: Routledge.
Marty, Martin E. and R. Scott Appleby, eds. (1995) Fundamentalisms Comprehended. [Fundamentalism Project, Vol. 5.] Chicago: University of Chicago Press.
McCarthy, Florence E. (1984) The Target Group: Women in Rural

Bangladesh. In An Exploration of Public Policy in Agriculture and Rural Development, ed. E. Clay and B. Schaffer, pp.49-57. London: Heinemann.

------(1993) Development From Within: Forms of Resistance to Development Processes Among Rural Bangladeshi Women. In Clark, Alice W., ed., Gender and Political Economy: Explorations of South Asian Systems, pp.322-353. Delhi: Oxford University Press.

Moghadam, Valentine M., ed. (1994) Identity Politics and Women: Cultural Reassertions and Feminisms in International Perspective. Boulder: Westview Press.

Moore, Henrietta L. (1988) Feminism and Anthropology. Cambridge: Polity Press.

Moser, Caroline (1993) Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training. London: Routledge.

Ong, Aihwa (1987) Spirits of Resistance and Capitalist Discipline: Factory Women in Malaysia. New York: State University of New York.

Scott, J C. (1985) Weapons of the weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. Haven/London: YealUniversity Press.

Siddiqi, D. (1991) Discipline and Protect....Grassroots, 1(2)

Special Programme on Women and Development (1993) Women, Islam and Development. The Hague: Ministry of Foreign Affairs.

Wallace, B., R. Ahsan, S. Hussain, and E. Ahsan (1987) The Invisible Resource: Women and Work in Rural Bangladesh. London: Westview Press.

White, Sarah C. (1990) Women and Development: A New Imperialist Discourse. In Journal of Social Studies, 48:90-111.

-----(1992) Arguing with the Crocodile: Gender and Class in Bangladesh. London: Zed Books

Whitehead, A. (1981) 'I'm Hungry Mum': The Politics of Domestic Budgeting. In K. Young et al., eds., Of Marriage and the Market: Women's Subordination Internationally and its Lessons. London: Routledge.

Yuval-Davis, N. and Anthias, F., eds. (1989) Woman-Nation-State. London: Macmillan.